শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদক

১। ৩০০

প্রথম প্রকাশ :—
কার্ত্তিক ১৩৫৫
প্রকাশ করেছেন :
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে
কো-অপারেটিফ বুক ডিপো
৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :—
শিল্পী—নরেন্দ্রনাথ দত্ত
ছেপেছেন :—
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

ভূমিকা

টলষ্টয়ের জগৎ-খ্যাত উপন্যাস Kreutzer Sonata-র এই বঙ্গানুবাদের নাম ইচ্ছা করিয়াই 'এ যুগের অভিশাপ' রাখিলাম। এই উপন্যাসের অন্তরালে টলষ্টয় যে-কথাটী ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই নামকরণ করিয়াছি।

স্ত্রীর ব্যাভিচারে সংক্ষুব্ধ হইয়া স্বামী স্ত্রীকে খুন করে, সেই খুনী স্বামী তাহার বিবাহিত জীবনের সমস্ত নিগূঢ় কাহিণী, হত্যার সমস্ত সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া নিজেই বর্ণনা করিতেছে···এই হইল উপন্যাসের মূল ঘটনা। কিন্তু মহাশিল্পী যে-ভাবে এই কাহিণীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এই কাহিণীর অবকাশে য়ুরোপের বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বজ্র-নির্ঘোষে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র য়ুরোপ সচকিত হইয়া উঠে। এই একখানি বই গত-যুগে একটা সমগ্র মহা-দেশের চেতনার মূলে যে তীব্র স্পন্দন জাগাইয়া তোলে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে বিরল।

জগতে যে-সব সাহিত্যিক মহাকালের হাতে রাজ-টীকা লাভ করিয়াছেন, টলষ্টয় তাঁহাদের একজন। এই একটী লোক, তাঁহার সমগ্র-জীবনের সাধনা দিয়া সাহিত্যকে এক নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। এক সুবিপুল নূতন দায়িত্ব সাহিত্যেকের উপর দিয়া গিয়াছেন। তাই টলষ্টয়ের সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও তিনি রুষ ভাষায় রুষ-সাহিত্যই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক রচনার মধ্যে দেশাতীত এক

বিরাট আদর্শ-বোধ রহিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য প্রত্যেক দেশের লোকই তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পর্শ পাইয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার আদর্শবাদের সহিত প্রাচ্য-মনেরই অধিকতর নিকট সম্পর্ক। তাই টলষ্টয়ের সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ভারতবাসীর কাছে এত প্রিয়। কারণ তাঁহার মন ভারত-মনেরই পরমাত্মীয়। জীবনের অন্য আর এককক্ষেত্রে এই কথা আজ ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যে মহাপুরুষের আদর্শবাদে আজ ভারতবর্ষ নব-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে, সেই মহাত্মা গান্ধী একদা টলষ্টয়ের রচনা ও আদর্শবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার আত্ম-স্ফীত বিস্তারেব :মহা-উল্লাসের মধ্যে টলষ্টয় পুরাকালের ঋষিদের মতন আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিয়া তুলিলেন, সেই আত্ম-স্ফীত সভ্যতার বিরুদ্ধবাণী। মানুষের মনের গহন গুহায় লুক্কায়িত মানবের অমৃতত্বকে আবার বিভ্রান্ত জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। য়ুরোপ সচকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

টলষ্টয়ের প্রত্যেক রচনার মধ্যে তাঁহার সেই একোদ্দিষ্ট সাধনার স্পষ্ট ছাপ আছে। তাঁহার প্রত্যেক রচনাই হইল বিদ্যুৎ-ময় প্রাণের প্রকাশ। তাহাকে স্বীকার করিতে না পার, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই।

এবং তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে এই Kreutzer Sonata হইল, তাঁহার প্রাণ-শক্তির সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

এ যুগের অভিশাপ

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ কাম-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে কোন নারীকে, দেহের সঙ্গমের আগেই অন্তরে সে করেছে সেই নারীর সঙ্গে যৌন-ব্যাভিচার।"

ম্যাথু, ৫ম—২৮

বসন্তকাল সবেমাত্র পড়েছে। দুটি পূরো দিন আর একটি রাত চলেছি ট্রেনে, প্রাণান্তকর ক্লান্তির মধ্যে। কাছের যাত্রীরা ক্রমাগত উঠছে আর নামছে; তার মধ্যে আমি ছাড়া আর তিনটি প্রাণী, যেখান থেকে যাত্রা সুরু হ'য়েছে সেখান থেকে সমানে এই কামরাতে আছে। সেই তিনজনের মধ্যে একজন হলেন মহিলা, আজ আর তাঁকে তরুণী বলা যায় না এবং তেমন আকর্ষণীয়ও কিছু নন, অনবরত সিগারেট খাচ্ছেন, গায়ে পুরুষদের পরিধেয় লম্বা কোট, মাথায় ছোট্ট ফেল্ট্-হ্যাট, মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায়, বহুদিনের বহু-বেদনার সুগভীর ছাপ; দ্বিতীয় জন তাঁরই

সহযাত্রী একজন পুরুষ-বন্ধু, বছর চল্লিশ বয়স, রীতিমত বাচাল, পরণে চটকদার নতুন-তৈরী পোষাক; তৃতীয় সহযাত্রীটি খর্ব্বাকৃতি, চঞ্চল, ব্যতিব্যস্ত-ধরণের লোক, বয়সের দিক্ থেকে বৃদ্ধ বলা যায় না অবশ্য, কিন্তু ইতিমধ্যেই কোঁকড়ানো চুলে চূণকাম সুরু হয়ে গিয়েছে। অন্য যাত্রীদের স্পর্শ এড়িয়ে তিনি এক কোণে একলা বসে আছেন···চোখের দৃষ্টি অনবরত এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর ওপর যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরিধানে একটা পুরাণো ওভারকোট, দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন হাল-ফ্যাসানের দর্জ্জির তৈরী, কোটের সঙ্গে লাগানো আসট্রাখান কলার, তার সঙ্গে মানিয়ে মাথায় আসট্রাখান টুপী। কোটের নীচে জ্যাকেট এবং তার তলায় পাড়-বসানো শার্ট, রাশিয়ান শার্ট বলে যা পরিচিত। ভদ্রলোকটির একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম—মাঝে মাঝে গলা দিয়ে অদ্ভুত-ধরণের এক আওয়াজ করে উঠছেন, কতকটা ছোট্ট কাসির মত, যেন কাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। এতটা পথ যে চলে এলাম, দেখি, লোকটি সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করবার সমস্ত সুযোগ সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। অনেকেই আলাপ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সব কথার উত্তরে শুধু কোনরকমে একটা রুক্ষ হাঁ-হুঁ দিয়েই সেরেছেন। পাছে কথা বলতে হয় বলে বই পড়তে সুরু করে দেন, কিংবা আনমনে সিগারেট খেতে খেতে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকেন, কিংবা একটা পুরোণো ব্যাগ থেকে খাবার জিনিসপত্র

বার করে, একটু-আধটু কিছু খান, নিজের চা নিজেই তৈরী করে নেন। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, তাঁর এই স্বেচ্ছাবৃত একাকিত্বে বোধহয় তিনি নিজেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছেন ; তাই দু-একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা যে আমি করিনি, তা নয় ; তবে যখনি আমাদের চোখাচোখি হয়, এমন অনেক বারই হয়েছে, কারণ ভদ্রলোকটি একটু দূরে ঠিক আমার সামনাসামনি আসনেই বসেছিলেন—প্রত্যেক বারই তিনি হয় বই-পড়ায় নতুন করে মনঃসংযোগ করেছেন, নতুবা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে আমার দৃষ্টির আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে একটা বড় স্টেশনে গাড়ীটা এসে থামতে দেখি, এই বায়ুগ্রস্ত ভদ্রলোকটি কামরা থেকে নেমে চায়ের জন্যে গরম জল সংগ্রহ করে ফিরলেন। নতুন-পোষাক-পরা যাত্রীটি, পরে জানলাম যে, তিনি একজন উকীল, সহযাত্রী বান্ধবীটিকে নিয়ে স্টেশনের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে চা-পান করতে ঢুকলেন। সেই অবসরে কামরায় কতকগুলি নতুন যাত্রী উঠে পড়লো, তাদের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি একজন বৃদ্ধ, পরিষ্কারভাবে দাড়ি-গোঁপ কামানো, দেখলেই বোঝা যায়, ব্যবসাদার লোক, সারা মুখ রেখায় ভরা, গায়ে মস্তবড় ফারের কোট, আমেরিকার চামড়ার তৈরী, মাথায় দিব্য ছুঁচলো সুতির ক্যাপ, যেখানে সেই উকীল আর তাঁর বান্ধবী বসেছিলেন, তার সামনেই এসে বসলেন। বসার সঙ্গে-সঙ্গেই

এক অল্পবয়সী তরুণের সঙ্গে কথা বলতে স্থুরু করে দিলেন, তরুণটি খুব সম্ভব কেরাণী হবে এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই কামরায় ঢোকে।

আমি তার বিপরীতদিকে একেবারে এক কোণে বসে-ছিলাম এবং ট্রেনটা থেমে ছিল বলেই, মাঝখান দিয়ে যখন কেউ চলাচল করছিল না, তখন তাদের কথাবার্ত্তা অংশত বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলাম। ব্যবসাদার লোকটিই প্রথম কথা বলতে স্থুরু করেন, পরের স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও তাঁর জমিজমা আছে, তাই দেখতে চলেছেন। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই স্থুরু হলো, বাজার-দরের কথা, ব্যবসার কথা, মস্কোর বাজারের হালচাল, সেখান থেকে উঠলো নিজ্‌নী নভোগোরডের মেলার কথা। মেলার কথা উঠতেই কেরাণী যুবকটি সেই মেলায় স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ধনী-ব্যবসাদারের মদ-খাওয়া এবং আনুষঙ্গিক নারী-ঘটিত ব্যাপারের গল্প স্থুরু করে দিল, কিন্তু তার গল্প তাকে শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধলোকটি তাঁর যখন বয়স-কাল ছিল, সেই সময়কার কুনাভিন মেলায় পুরাকালে যে-সব ফ্‌র্ত্তি হতো, তার গল্প আরম্ভ করে দিলেন। তাতে তিনিও অবশ্য লিপ্ত ছিলেন এবং সে-কথা সগর্ব্বেই তিনি ঘোষণা করলেন। সেই কুনাভিন মেলায়, আজও বলতে তাঁর আনন্দ উছলে পড়ছে, সেই ধনী ব্যবসাদার লোকটি আর তিনি মত্তাবস্থায় এমন একটা কাণ্ড করেছিলেন, যা বলতে গেলে কানে কানে বলা ছাড়া আর

গত্যন্তর নেই। সেই কথা না শুনে সঙ্গের কেরাণীটি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলো—তার সেই হাসির শব্দে কামরার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত দুলে উঠলো; সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধটিও দুই কষের দুই হল্‌দে দাঁত বের করে হেসে ফেটে পড়লেন। আসন ছেড়ে কামরার দরজার কাছে গিয়ে মনে করলাম, যতক্ষণ না গাড়ী আবার ছাড়ে, ততক্ষণ প্লাটফর্মে নেমে বরঞ্চ একটু পায়চারি করি। নামতে যাবো, এমন সময় দেখি, সেই মহিলা-সহযাত্রীটি তাঁর বান্ধবের সঙ্গে গল্পে মশ্‌গুল হয়ে ফিরছেন।

আমাকে দেখে বাচাল উকীল ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, "নামছেন কি, সময় তো নেই—সেকেণ্ড বেল্‌ দিল বলে।"

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। ট্রেনের শেষ বরাবর যেতে না যেতেই ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি ছুটে ফিরে এলাম। দেখি, সেই উকীল আর তাঁর সঙ্গিনীটি তেমনি মশ্‌গুল হয়ে কথা বলে চলেছে। তাঁদের সামনে যে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীটি বসে ছিলেন, তিনি সোজা সামনের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে নিজস্ব ভঙ্গীতে ঠোঁট নেড়ে চলেছেন।

উকীল ভদ্রলোকটির পাশ দিয়ে আমার আসনের দিকে যেতে যেতে শুনলাম, তিনি মৃদু হেসে মন্তব্য করছেন, "তারপর মেয়েটি সোজা সব কথা তার 'স্বামীকে জানিয়ে' দিল··· অতঃপর সে আর কোন মতেই তার সঙ্গে বাস করতে পারবে না, বাস করতে চায়ও না···কারণ···"

গল্পের অবশিষ্ট অংশ আমি আর শুনতে পেলাম না, কারণ আমি আসনে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীরা মাঝখানে ভিড় করে দাঁড়ালো। তারপর গার্ড এলো—তার পেছনে এলো মালপত্র নিয়ে একজন কুলী। কিছুক্ষণের জন্যে তাই নিয়ে এমন গোলমাল আর চেঁচামিচির সৃষ্টি হলো যে, তাঁদের কথাবার্ত্তার একটা বর্ণও আর বুঝতে পারলাম না।

গোলমাল থেমে যাওয়ার পর উকীল ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো, কিন্তু তাঁরা তখন কথার প্রসঙ্গ বদলে ব্যক্তিগত কথা থেকে সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন। উকীল ভদ্রলোকটি ডাইভোর্স সম্পর্কে তাঁর মতামত জাহির করে বলছিলেন, সারা য়ুরোপে এখন এই ডাইভোর্সের সমস্যা নিয়ে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত রীতিমত উদ্‌গ্রীব ও চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে এবং রাশিয়াতে এখন আদালত বেশীরভাগ রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বপক্ষে দিচ্ছে। হঠাৎ কথা বলতে বলতে উকীল ভদ্রলোকের হুঁস হলো যে, সারা কামরার মধ্যে একমাত্র তাঁরই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে,—তাই হঠাৎ কথা-বলা বন্ধ করে, বৃদ্ধলোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন,—"কি বলেন, সেকালে এসব কিছুই ছিল না—অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস, কি বলেন ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেন ছেড়ে দিল। তখন তিনি মাথা থেকে টুপীটা খুলে, হাত দিয়ে বুকে ক্রশের চিহ্ন করে

নিঃশব্দে যেন প্রার্থনা আওড়াতে আরম্ভ করে দিলেন। অগত্যা উকীল ভদ্রলোকটি বাইরের দিকে চেয়ে ভদ্রতার খাতিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তাঁর ধর্ম্মকার্য্য শেষ হয়। প্রার্থনা শেষ হলে, ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি যথারীতি আবার তিনবার সারা অঙ্গে ক্রুশের চিহ্ন গ্রহণ করে মাথায় টুপীটি ঠিক করে রাখলেন, তারপর নিজের আসনে সুবিধামত হেলে-দুলে ঠিক করে বসে নিয়ে উত্তর দিলেন—"সেকালেও এ-সব ঘটতো, তবে আজকালকার মত ঘন-ঘন ঘটতো না। এখন অবশ্য এত ঘন-ঘন না হয়ে উপায়ান্তর নেই—কারণ এখন আমরা সুসভ্য হয়েছি, আশ্চর্য্য-রকম সুসভ্য হয়েছি!"

ক্রমশ ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের অদ্ভুত শব্দ সব জেগে উঠতে লাগলো, সেইজন্যে কামরার ভেতরে তাঁদের কথাবার্ত্তা শোনা একরকম অসাধ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু তাঁদের এই আলোচনা শুনতে আমার রীতিমত ভালই লাগছিল, সেইজন্যে বাধ্য হয়েই আমি তাঁদের কাছ ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম। আমার নিকট-প্রতিবেশী উদগ্র বায়ু-গ্রস্ত সেই ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এই আলোচনায় তাঁরও ঔৎসুক্য যেন জেগে উঠেছে। নিজের জায়গা না ছেড়ে তিনি প্রাণপ্রণ চেষ্টা করছিলেন, কি করে তাদের কথাবার্ত্তা শোনা যায়।

ওষ্ঠে ক্ষীণ-হাসি এনে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, "আপনি যে বলছিলেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এর জন্যে

দায়ী, কি করে? আগে যে বিয়ে হতো, বর-কনে বিয়ের আগে কেউ কাউকে জানতে পারতো না, সে-বিয়ে যে আজকালকার বিয়ের থেকে ভাল ছিল, এ-কথা নিঃসন্দেহে কিছুতেই বলা যায় না। পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগে কি না, কিংবা ভাল লাগতে পারে কি না, তার কিছুই তারা জানতো না, তবুও তাদের বিয়ে করতে হতো তাকে, যাকে তারা আদৌই জানে না, চিনে না, তার ফলে বিয়ের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে বরণ করে নিতো তারা সারা জীবনের অশান্তিকে। আপনার মতে সেইটে কি খুব বাঞ্ছনীয় অবস্থা ছিল?"

মহিলাটির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি নিজের কথারই পুনরুক্তি করলেন, "আজকাল লোকে সভ্য হয়েছে, আশ্চর্য্য-রকমের সব সভ্য হয়েছে!"

কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম, মহিলাটির দিকে তিনি রীতিমত ঘৃণার দৃষ্টিতেই চেয়েছিলেন।

মৃদু হেসে উকীল জিজ্ঞাসা করে উঠলেন—"বিবাহিত জীবনের গ্লানির সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার যে কি সম্পর্ক, অনুগ্রহ করে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, বিশেষ বাধিত হব।"

ব্যবসাদার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মহিলাটি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"যাই বলুন, সেকাল আর ফিরে আসছে না...কিছুতেই না...।"

—"আহা, ওঁর যা বক্তব্য, ওঁকে তা বলতে দিন্।" মহিলাটিকে বাধা দিয়ে উকীল বলে ওঠে।

স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রোক্তির মত ব্যবসাদার ঘোষণা করেন, "শিক্ষা থেকেই জন্মগ্রহণ করে বিমূঢ়তা—"

মহিলাটি অধীর-আগ্রহে প্রতিবাদ করে ওঠেন—"যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে না, বিয়ের নামে তাদের যারা একসঙ্গে বেঁধে দেয়, তারাই আবার সকলের চেয়ে বেশী অবাক্ হয়ে যায়, যখন দেখে সেই বিয়ের ফলে স্বামী বা স্ত্রী কেউই সুখী হতে পারলো না।"

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাটি একবার উকীলের দিকে, আর একবার সেই কেরাণীর দিকে যেন মৌন-সমর্থনের জন্যে দৃষ্টিপাত করেন। ব্যবসাদার ভদ্রলোকটিকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করবার জন্যেই তিনি বলে চলেন—শুধু জন্তুদেরই ঐরকম ভাবে মালিকের ইচ্ছেয় জোড় বেঁধে দেওয়া চলে। মানুষ তো আর জন্তু নয়—প্রত্যেক পুরুষ বা প্রত্যেক মেয়ের একটা স্বতন্ত্র ভাল-লাগা না-লাগা আছে, একটা স্বতন্ত্র বাসনা-কামনা আছে।"

ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি প্রতিবাদ করে ওঠেন—"এ-রকম-ভাবে কথা বলা আপনার উচিত নয়। মানুষ পশু নয়, তা সবাই জানে এবং সেইজন্যেই মানুষ আইন-কানুন তৈরী করেছে।"

—"ঠিক কথাই। কিন্তু বলতে পারেন, সে-ক্ষেত্রে কি করে একত্র বাস করা যায়?"

মহিলাটি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে ওঠেন। তাঁর ধারণা যেন তিনি খুব নতুন কথাই কিছু বলেছেন।

পরম-বিজ্ঞের মত গম্ভীরকণ্ঠে ব্যবসাদার উত্তর দেন—"সেকালে এই সব ব্যাপার নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাতো না। আজকাল এটা যেন একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর সংসারের মধ্যে যেই একটা কিছু সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দেয়, অমনি স্ত্রী রুখে উঠেন, 'আমি তোমার সঙ্গে আর বাস করতে চাই না—!' এমন কি চাষীদের মধ্যেও এই ব্যায়রাম ছড়িয়ে পড়েছে, তারাও ভদ্রলোকদের দেখাদেখি এই সব বলতে-কইতে আরম্ভ করেছে। একটা কিছু হোক্ না, অমনি চাষার বউ স্বামীর মুখের ওপর শুনিয়ে দেবে, 'এই রইলো তোর জামা-কাপড়, আমি চললুম জ্যাকের সঙ্গে। তোর চেয়ে তার মাথার চুল ঢের-ঢের ভাল।' এই তো হলো ব্যাপার! মেয়ে-মানুষের মনে যদি ভয়ই না থাকলো, তা হলে সে কিসের মেয়ে-মানুষ?"

কেরাণী ভদ্রলোকটি একবার উকীলের দিকে, একবার মহিলাটির দিকে, আর একবার আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। হাসতে ইচ্ছে করলেও সাহস করে হাসতে পারে না। ঠোঁটের কোণে জমিয়ে রাখে। হাসবার বা কিছু বলবার আগে সে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যবসাদারের বক্তব্য শ্রোতারা কি-ভাবে গ্রহণ করলো, সেই বুঝেই সে প্রতিবাদ করবে, কিংবা হেসে সমর্থন জানাবে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—"ভয়? ভয় বলতে আপনি কি বলতে চান?"

—"বাইবেলে বলেছে, 'প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে ভয় করবে', এখানে ভয় বলতে যা বোঝায়, তাই— ।"

তিক্তকণ্ঠে মহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন—"সে সব যুগ বহুদিন হলো চলে গিয়েছে, বুঝেছেন মশাই।"

বৃদ্ধভদ্রলোকটি জবাব দিয়ে ওঠেন—"না ম্যাদাম, সে-সব যুগ চলে যেতে পারে না। পুরুষের বুকের পাঁজরা থেকেই আদিম নারীর জন্ম হয়েছিল এবং যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন এই কথাই সত্য হয়ে থাকবে।"

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ এমন জোরে ঘাড় নাড়তে থাকেন যে, কেরাণীটির স্থিরবিশ্বাস হয়ে যায় যে, এই বিতর্কে বৃদ্ধই জয়ী হয়েছে—অতএব সে এখন নিশ্চিন্তে হাসতে পারে। তাই বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে জমান হাসি ফেটে পড়ে।

এত সহজে মহিলাটি পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রোতাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি যেন আপনার মনে বলে ওঠেন—"তাই বটে, এই সম্পর্কে তর্ক করতে গেলেই পুরুষদের মুখে ঐ এক বুলি— ; পুরুষ, তারা নিজেরা স্বাধীন থাকবে, প্রয়োজন হলে তার জন্যে আন্দোলন করবে, আর মেয়েদের বাড়ীর ভেতর খিল দিয়ে আটকে রাখবে! নিজেদের পূরোমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করতে যাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী না হয়, সেদিকে পুরুষদের চেষ্টার এতটুকু কমতি নেই।"

—"তার জন্যে কারুর অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন আমাদের নেই। এ কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখবেন, পুরুষ-মানুষ তার বাড়ীর বাইরে যে ব্যাভিচার করে, তার ফলে তার সংসারে কোন নতুন সন্তানের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী বাইরের অনাচারের ফলকে অসহায়ভাবে ঘরের মধ্যে বহন করে আনে—সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ভাবে সে অসহায়—।"

প্রত্যেক শব্দটি ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি স্পষ্ট উচ্চারণ করে এমন গম্ভীরভাবে জোর দিয়ে বল্লেন যে, শ্রোতাদের ওপর তার প্রভাব স্পষ্টই প্রতিভাত হয়ে উঠলো। এমন কি মহিলাটিও পরাজয় অনিবার্য্য হয়ে উঠছে বুঝে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও তিনি কিছুতেই হার মানতে রাজী নন।

—"তবুও, সব মেনে নিলেও একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মেয়েদেরও দেহ রক্ত-মাংস দিয়েই তৈরী—পুরুষের মতন তারও মন বলে একটা জিনিস আছে। যদি সে দেখে, তার স্বামীকে সে ভালবাসতে পারলো না, সে কি করবে তখন ?"

চোখ ঘুরিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ব্যবসাদার তপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন—"যদি স্বামীকে ভালবাসতে না পারে ? তাতে বিচলিত হবার কি আছে ? ভালবাসতে শিখবে—সেই হবে তার কর্ত্তব্য !"

এই অপ্রত্যাশিত যুক্তি বিশেষ করে কেরাণী ভদ্রলোকটির

মনঃপূত হওয়ায় আনন্দে একটা ভাষাহীন আওয়াজ তার গলার ভেতর থেকে আপনা হতে বেরিয়ে পড়ে।

মহিলাটি প্রতিবাদ করেন—"তাই বটে! কিন্তু কথা হলো, ভালবাসা শিখতে যে তার মনই চাইবে না। অন্তরে যদি ভালবাসা না থাকে, তবে জগতের কোন চেষ্টাতেই তাকে আনা সম্ভব নয়।"

হঠাৎ মাঝখান থেকে উকীল জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—"বেশ, যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাস হারাবার মত কাজ করেছে, তা হলে?"

তার উত্তর আসে বৃদ্ধের কাছ থেকে—"সে-প্রসঙ্গ এখানে ওঠে না। যাতে সে-রকম কোন ব্যাপার না ঘটতে পারে, তার জন্যে প্রত্যেক স্বামীরই ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"কিন্তু এরকম তো প্রায়ই হয়, স্বামীর সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও এই জাতীয় ঘটনা ঘটে—তখন কি হবে?"

ব্যবসাদার জবাব দেন—"অন্য যেখানেই তা হোক না কেন, আমাদের সমাজে তা হয় না—"

হঠাৎ সবাই নীরব হয়ে যায়। কেরাণী স্থান-পরিবর্ত্তন করে আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে বসে। যেন সকলের আড়ালে পড়ে থাকতে সে চায় না। ঈষৎ হাসির সঙ্গে সে এবার বলতে সুরু করে—"একটা ব্যাপার আমাদেরই মধ্যে ঘটেছিল—রীতিমত কেলেঙ্কারীর ব্যাপার এবং একটু জটিলও বটে। শুনুন,—যে-স্ত্রীলোকটির কথা বলছি, তাকে

অবশ্য, যাকে বলে একটু আলগা-ধরণের মেয়ে তাই বলা যায়। নানারকমের ছিল তার খেয়াল। তার স্বামী-বেচারা ছিল,—চলতি ভাষায় যাকে বলে ভালমানুষ—বুদ্ধি-শুদ্ধির অবশ্য কোন গোলমাল ছিল না। স্ত্রীলোকটি গোপনে দোকানদার এক ছোঁড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি সুরু করে দিল। স্বামী জানতে পেরে ভালকথায় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বারণ করে, কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। স্ত্রীলোকটি নিজের খেয়ালমত যা খুশী তাই করে বেড়াতে আরম্ভ করে। শেষকালে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে, লুকিয়ে স্বামীর পকেট থেকে পয়সা-কড়ি চুরি করতে লাগলো। শেষকালে একদিন স্বামী প্রহার দিল। তার ফলে কি হলো ভাবছেন? দিন-দিন তার মতিগতি আরো খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, শেষকালে একটা অখৃষ্টান বাজে লোক—একটা ইহুদী, তার সঙ্গে পালিয়ে গেল। এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো, তার স্বামী কি করবে? বেচারা তার সম্পর্ক একেবারে মুছেই ফেলেছে—অবিবাহিত লোকদের মত একলাই এখন বসবাস করছে, ওধারে স্ত্রীলোকটি ক্রমশঃ পাঁকের মধ্যে ডুবেই চলেছে—।”

বৃদ্ধ গর্জ্জন করে ওঠেন—“স্বামীটা হলো একটা আস্ত গাধা। গোড়াতেই যখন সে জানতে পারলো তখন যদি উত্তম-মধ্যম দিয়ে সায়েস্তা করতো, আমি হলফ করে বলতে পারি, দেখতে, আজ সে তার পাশেই আছে। কথাটা কি জান,

যখনি দেখবে, তারা সুরু করেছে, তখনি—একেবারে গোড়াতেই আটকে দিতে হবে। কথায় বলে না, মাঠে ঘোড়াকে আর ঘরে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই।”

এই সময় পরের স্টেশনের জন্যে টিকিট সংগ্রহ করতে গার্ড এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ তার টিকিট দিয়ে দিল।

—“ঠিক বলেছেন স্যার, সময় থাকতে স্ত্রীলোককে বশ করতে হয়, নইলে একটু ফাঁক দিয়েছেন কি সব সাবাড়।”

আর চুপ করে থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলাম—“কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে আপনি যে বলছিলেন কুনাভিন মেলায় পুরুষদের কাণ্ডকারখানার কথা, তার সঙ্গে এর সঙ্গতি কোথায়?”

উত্তরে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—“ওঃ, সে হলো একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।” বলেই নীরব হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই এঞ্জিনের তীব্র বংশী-ধ্বনি বেজে উঠলো। আসনের তলা থেকে একটা ব্যাগ টেনে বার করে নিয়ে গায়ের ফারের কোটটা ভাল করে জড়িয়ে বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। মাথা থেকে টুপিটা ঈষৎ মুক্ত করে গাড়ী থেকে বেরিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়লেন।

বৃদ্ধের অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গে আবার সুরু হলো বচসা। সকলেই একসঙ্গে যে যার বক্তব্য বলতে সুরু করে দিল।

বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে কেরাণী বলে উঠলো—“সেকালের আমলের জবরদস্ত বাড়ীর কর্তা—।”

অবশ্য, যাকে বলে একটু আলগা-ধরণের মেয়ে তাই বলা যায়। নানারকমের ছিল তার খেয়াল। তার স্বামী-বেচারা ছিল,— চলতি ভাষায় যাকে বলে ভালমানুষ—বুদ্ধি-শুদ্ধির অবশ্য কোন গোলমাল ছিল না। স্ত্রীলোকটি গোপনে দোকানদার এক ছোঁড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি সুরু করে দিল। স্বামী জানতে পেরে ভালকথায় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বারণ করে, কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। স্ত্রীলোকটি নিজের খেয়ালমত যা খুশী তাই করে বেড়াতে আরম্ভ করে। শেষকালে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে, লুকিয়ে স্বামীর পকেট থেকে পয়সা-কড়ি চুরি করতে লাগলো। শেষকালে একদিন স্বামী প্রহার দিল। তার ফলে কি হলো ভাবছেন? দিন-দিন তার মতিগতি আরো খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, শেষকালে একটা অখৃষ্টান বাজে লোক—একটা ইহুদী, তার সঙ্গে পালিয়ে গেল। এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো, তার স্বামী কি করবে? বেচারা তার সম্পর্ক একেবারে মুছেই ফেলেছে—অবিবাহিত লোকদের মত একলাই এখন বসবাস করছে, ওধারে স্ত্রীলোকটি ক্রমশঃ পাঁকের মধ্যে ডুবেই চলেছে—।"

বৃদ্ধ গর্জ্জন করে ওঠেন—"স্বামীটা হলো একটা আস্ত গাধা। গোড়াতেই যখন সে জানতে পারলো তখন যদি উত্তম-মধ্যম দিয়ে সায়েস্তা করতো, আমি হলফ করে বলতে পারি, দেখতে, আজ সে তার পাশেই আছে। কথাটা কি জান,

যখনি দেখবে, তারা সুরু করেছে, তখনি—একেবারে গোড়াতেই আটকে দিতে হবে। কথায় বলে না, মাঠে ঘোড়াকে আর ঘরে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই।"

এই সময় পরের স্টেশনের জন্যে টিকিট সংগ্রহ করতে গার্ড এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ তার টিকিট দিয়ে দিল।

—"ঠিক বলেছেন স্যার, সময় থাকতে স্ত্রীলোককে বশ করতে হয়, নইলে একটু ফাঁক দিয়েছেন কি সব সাবাড়।"

আর চুপ করে থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলাম—"কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে আপনি যে বলছিলেন কুনাভিন মেলায় পুরুষদের কাণ্ডকারখানার কথা, তার সঙ্গে এর সঙ্গতি কোথায়?"

উত্তরে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—"ওঃ, সে হলো একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।" বলেই নীরব হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই এঞ্জিনের তীব্র বংশী-ধ্বনি বেজে উঠলো। আসনের তলা থেকে একটা ব্যাগ টেনে বার করে নিয়ে গায়ের ফারের কোটটা ভাল করে জড়িয়ে বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। মাথা থেকে টুপিটা ঈষৎ মুক্ত করে গাড়ী থেকে বেরিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়লেন।

বৃদ্ধের অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গে আবার সুরু হলো বচসা। সকলেই একসঙ্গে যে যার বক্তব্য বলতে সুরু করে দিল।

বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে কেরাণী বলে উঠলো—"সেকালের আমলের জবরদস্ত বাড়ীর কর্ত্তা—।"

মহিলাটি সমর্থন করলেন—"শাসনের নামে প্রাণান্তকর অত্যাচার—স্ত্রীলোক আর বিবাহ-সম্বন্ধে কি বর্ব্বর ধারণা!"

উকীল মন্তব্য করলেন—"সত্যি, বিবাহ সম্পর্কে য়ুরোপের সুসভ্য চিন্তাধারা থেকে আমরা এখনো বহু দূরে পিছিয়ে পড়ে আছি।"

ভদ্রমহিলাটি নিজের শেষ বক্তব্যের সূত্র ধরে বলতে সুরু করেন—"আসল কথা কি জানেন, একান্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, এই-জাতীয় পুরুষেরা আজও পর্য্যন্ত বোঝেন না যে, প্রেমহীন বিবাহ বিবাহই নয়। প্রেমই হলো বিবাহের আসল মন্ত্র এবং সেই হলো ধর্ম্মসিদ্ধ বিবাহ, যার পেছনে আছে প্রেমের অনুমোদন।"

কেরাণী গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, যেন কথাগুলো মনে গেঁথে রাখতে চেষ্টা করছে, কারণ ভবিষ্যতে অন্য কোন জায়গায় এই সব লাগ-সই ভাল-ভাল কথা প্রয়োগ করবার দরকার হতে পারে।

মহিলাটির বক্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ একটা কিসের যেন আওয়াজ হলো, জোর করে হাসি বা কান্না চাপতে গেলে যে রকম আওয়াজ হয়। ফিরে চেয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী সেই অর্দ্ধ-শুভ্রকেশ বাক্যহীন নিঃসঙ্গ লোকটি কথাবার্ত্তার ফাঁকে কখন আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের খুব কাছেই উঠে এসে বসেছেন। তাঁর মুখের মধ্যে উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমাদের এই আলোচনা তাঁকে

রীতিমত আকৃষ্ট করেছে। আসনের পেছন দিকে হাতের উপর ভর দিয়ে ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে আছেন···দেখলেই মনে হয় যেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন···সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে···তার মধ্যে বেদনার আকুঞ্চন-রেখা স্পষ্টই চোখে ধরা পড়ে।

উত্তেজিতকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করে ওঠেন, প্রেম···কি ধরণের প্রেমের কথা বলছেন? কি সে প্রেম যা বিবাহকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দেয়?

ভদ্রমহিলা প্রশ্নকর্ত্তার উত্তেজিত অবস্থা লক্ষ্য করে যথাসম্ভব মধুর এবং সহজ সুস্থভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করেন,

—মানে, আসল সত্যিকারের ভালবাসা। যদি সেই রকম ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে থাকে, তাহলেই বিবাহ সম্ভব।

ভদ্রলোকটির দুটি উজ্জ্বল চোখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক কুণ্ঠিত হাসি দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করেন. কিন্তু কোন্‌টা আসল সত্যিকারের ভালবাসা? কি তার সংজ্ঞা?

কণ্ঠস্বরের পেছনে যেন ভীরু কুণ্ঠা কাঁপতে থাকে।

ভদ্রমহিলা প্রত্যুত্তর দেন, এর আবার সংজ্ঞা কি? আসল ভালবাসা যে কি, সবাই তা জানে!

—অন্ততঃ আমি জানি না···আপনি যদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলেন, প্রেম বলতে·· ভদ্রলোক প্রশ্ন শেষ করতে পারেন না।

ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন, কেন, এতো অতি সহজ ব্যাপার।

কিন্তু তার বেশী কিছু আর বলতে পারেন না। হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, কয়েক মুহূর্ত্ত যেন কি চিন্তা করে নেন। তারপর বলতে সুরু করেন, প্রেম কি? প্রেম হলো, পরস্পর পরস্পরকে একান্ত করে পাওয়া, যেন তাদের দুজনের বাইরে জগতের আর কোন লোকের কোন অস্তিত্ব নেই।

ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে ওঠেন, একান্ত করে পাওয়া। কতক্ষণের জন্যে? একমাসের জন্যে? দুদিনের জন্যে? না, আধঘণ্টার জন্যে?

ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি মুখে যা বলছেন, তার আড়ালে যেন অন্য কিছু বোঝাতে চাইছেন।

—না, না, অন্য কিছু নয়। আপনারা যে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, আমি সেই বিষয়ের কথাই বলছি!

উকীল ভদ্রলোকটি মহিলার পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে ওকালতী কায়দায় বলে উঠলেন, ভদ্রমহিলার বক্তব্য হলো, প্রথমতঃ,—বিবাহ সেইখানেই হওয়া উচিত, যেখানে পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের বন্ধন আগে থাকতে নির্দ্দিষ্ট থাকে···তা তাকে স্নেহই বলুন আর প্রেমই বলুন...কিম্বা অন্য যেকোন নামে তাকে অভিহিত করুন। এবং এই অনুরাগ যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহলেই বিবাহ হলো ধর্ম্ম-সিদ্ধ, নতুবা নয়! দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বক্তব্য হলো, যে-বিবাহ এই স্বাভাবিক

অনুরাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-অনুরাগকে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, সে-বিবাহের মধ্যে এমন একটা উপাদানের অভাব থেকে যায়, যার জন্যে তা পরস্পরকে স্থায়ত বেঁধে রাখতে পারে না।

এইখানে ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনার বক্তব্য আমি ঠিক মত বোঝাতে পেরেছি তো ?

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।

উকীল উৎসাহিত হয়ে আবার বলতে আরম্ভ করেন, তারপর কথা হলো···

কিন্তু বেশী দূর আর অগ্রসর হতে পারেন না···সেই উজ্জ্বল-দৃষ্টি নিঃসঙ্গ ব্যক্তির চোখ দুটী জ্বলন্ত কয়লার মতন জ্বলে ওঠে। ভেতরের অধীরতা আর রোধ করে রাখতে পারেন না, বাধা দিয়ে বলে ওঠেন,

—না··· আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি···পরস্পরের আকর্ষণের কথা···পরস্পরের অনুরাগের কথা··· কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, কতকাল এই আকর্ষণ স্থায়ী হতে পারে ?

ঘাড় দুলিয়ে ভদ্রমহিলা উত্তর দিয়ে ওঠেন, কতকাল মানে ? কেন, দীর্ঘকাল ধরে, অনেকক্ষেত্রে সারাজীবন ধরে থাকে···

—হাঁ, থাকে, কিন্তু শুধুই নভেলে, বাস্তব জীবনে নয়। প্রকৃত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পরস্পরের এই আকর্ষণ বড় জোর বছর কয়েক থাকে, তাও খুব কম ক্ষেত্রে ; সাধারণতঃ

কয়েক মাস, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন, কয়েক ঘণ্টা মাত্র তার আয়ু···

ভদ্রলোক কথা শেষকরার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন···তাঁর ধারণা, তাঁর এই উক্তিতে সকলেই বিস্ময়-সচকিত হয়ে উঠেছে···

তিনজন একসঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, একথা কি করে আপনি বলতে পারেন ? ক্ষমা করবেন···কিন্তু···

এমন কি কেরাণীটিও প্রতিবাদসূচক আওয়াজ করে ওঠে।

—হাঁ···হাঁ··· আমি জানি আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আপনারা আলোচনা করছেন যা হওয়া উচিত, তার কথা... আমি বলছি, যা ঘটছে বা ঘটে তার কথা। প্রত্যেক সুন্দরী নারীর জন্যে, যাকে আপনারা প্রেম বলছেন, তা প্রত্যেক পুরুষই অনুভব করে !

ভদ্রলোক রীতিমত জোর গলায় বলে ওঠেন।

—ছিঃ, এধরণের কুৎসিত কথা উচ্চারণ করাও অন্যায়। নিশ্চয়ই মানুষের জীবনে প্রেম আছে, অনুরাগ আছে, যে প্রেম, যে-অনুরাগের আয়ু শুধু মাস ধরে বা সপ্তাহ ধরে গোনা চলে না...সারা জীবন ব্যাপে থাকে তার আয়ু ! তাই নয় কি ? ভদ্রমহিলা সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

—কখনই নয়। যদিও এ রকম ব্যাপার কচিৎ কখন দেখা যায় যে, একজন পুরুষ সারাজীবন ধরে একটী নারীকেই কামনা করে গেল—কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ষোল-আনা সম্ভাবনা থেকে

যায় যে সে অন্য কোন পুরুষকে কামনা করবেই! চিরকাল জগতে এই হয়ে এসেছে এবং আজকে আমাদের এই পৃথিবীতে এই যুগেও তাই হচ্ছে।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট কেস্ বার করে ভদ্রলোক ধূমপান করতে সুরু করে দেন।

বিজ্ঞের মত উকীল মন্তব্য প্রকাশ করে, আকর্ষণটা পারস্পরিক।

তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে ওঠেন, না, তা হতে পারে না। এক গাড়ী সর্ষের মধ্যে কোন দুটো সর্ষে ঠিক পাশাপাশি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তা ছাড়া, সম্ভব অসম্ভব নিয়ে কথা নয়, কথাটার মূলে আসল যে কথাটা রয়েছে, সেটা হলো, দেহের ক্ষুধা, কামনার পরিতৃপ্তি। সারা জীবন ধরে একজন আর একজনকে ভালবেসে যাবে, সেকথা বলাও যা, আর একটা মোমবাতি সারাজীবন ধরে অনির্বাণ জ্বলবে, সে-কথা বলাও তাই।

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক জোরে একটান ধোঁয়া টেনে নেন। ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন, আপনি যে-ভালবাসার কথা বলছেন, সে হলো অন্য ধরণের ভালবাসা, নিছক কামনা। যে-ভালবাসা, একই আদর্শের সংযোগে, একই আত্মিক প্রেরণার মিলনে গড়ে ওঠে, সে-ভালবাসার অস্তিত্ব আপনি স্বীকার করেন না?

গলায় সেই বিচিত্র আওয়াজ করে ভদ্রলোক বলে ওঠেন,

একই আদর্শের সংযোগ ? আদর্শ না হয় তুজনের এক হলো, তাই বলেই কি একসঙ্গে শুতে হবে ? ক্ষমা করবেন, কথাটা একটু হয়ত কুৎসিত শোনালো কিন্তু তুজনের আদর্শ এক হলেই তুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকবে, এ ধারণা কি করে করতে পারেন ?

উকীল মধ্যস্থতা করতে ওঠেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বলতে বাধ্য হবো, জগতের বাস্তব ঘটনা কিন্তু আপনার বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। একথা আমাদের মানতেই হবে, বিবাহ আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সমগ্র মানব-সমাজ, অন্তত তার অধিকাংশই, বিবাহকে বরণ করে নিয়েছে এবং বহু বহু লোক দীর্ঘকাল ধরে বিবাহিত জীবনের মধ্যে থেকে রীতিমত সম্মানিত জীবনই যাপন করছেন।

অর্দ্ধ-শুভ্র-কেশ ভদ্রলোকটী হেসে উঠলেন, একটু আগেই আপনারা বলছিলেন, বিবাহ হলো প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি বল্লাম যে দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নেই, আপনারা প্রমাণ করতে উঠলেন যে, যেহেতু মানব-সমাজে বিবাহের অস্তিত্ব আছে, সেই হেতুই তার মধ্যে আছে প্রেমের অস্তিত্ব। এটা কি প্রমাণ হলো ? আর তা ছাড়া, আজকালকার বিবাহ···প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উকীল প্রতিবাদ করে, মাফ করবেন, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম

যে, বিবাহ বহুকাল থেকে মানব-সমাজে চলে আসছে এবং আজও চলছে···

—বিবাহ চলে আসছে···আজও চলছে। সত্যি কথাই, কিন্তু কেন চলছে? যে সব জাতি বিবাহের মধ্যে দেখেছে মানব-দৃষ্টির বাইরে অলৌকিক সত্ত্বার ইঙ্গিতকে, যারা স্বীকার করে নিয়েছে বিবাহের মধ্যে ধর্ম্মের অনুশাসনকে, যে-অনুশাসন তারা বিশ্বাস করে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বিধি বলে, প্রকৃত বিবাহ তাদের মধ্যেই ছিল এবং আজও তাদেরই মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যে নয়। আমাদের দেশে যারা বিবাহ করে, তারা এই সব ব্যাপারের কোন ধারই ধারে না, তাদের চেতনার মধ্যে এই জাতীয় গভীর কোন অতীন্দ্রিয় ধারণার অস্তিত্বই নেই, তাদের কাছে বিবাহ হয় প্রতারণা, না হয় অত্যাচার। যেখানে প্রতারণাই প্রবল, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করে চলে। কিছুদিন অনায়াসে কেটেও যায়। স্বামী আর স্ত্রী সেক্ষেত্রে সমাজকে প্রতারণা করে, সকলকে বোঝাতে চায় যে তারা প্রকৃত বিবাহ বন্ধনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে সুখেই আছে, কিন্তু আসলে যা চলছে তা হলো বহু-বিবাহ এবং বহু-স্বামিত্ব। খুবই কুৎসিত কিন্তু তবুও তা অসহনীয় নয়। স্বামী আর স্ত্রী বাহ্যত আজীবন একত্র বাস করবার শপথ যেখানে গ্রহণ করেছে অথচ যেখানে বিবাহের দ্বিতীয় মাস থেকেই বুঝতে পারে যে তারা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না, সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্যে অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও

কি বলা উচিত হবে, তা ঠিক করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম, যেন ঘুমুবার চেষ্টা করছি। বই পড়বো যে, তেমন আলোও তখন ছিল না। অন্ধকার হয়ে আসছে সব। এইভাবে পরের ষ্টেশনে গাড়ী এসে পৌছল। ভদ্রমহিলা আর তাঁর সঙ্গের সহযাত্রীটি গার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য কামরায় চলে গেলেন। কেরাণীটী হাত-পা ছড়াবার জায়গা পেয়ে পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লো। পদ্‌নিশেফ্ সারাক্ষণ চা-পানের সঙ্গে সিগারেট টেনে চলেছিল···আগের ষ্টেশনেই সে নিজের হাতে নিজের চা তৈরী করে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকার পর যেই চোখ খুলেছি, অমনি দেখি, পদ্‌নিশেফ্ আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে আমাকেই সম্বোধন করে' বলতে আরম্ভ করেছে,

—আমি যে কি, এখন তা জানতে আপনার বাকি নেই। যদি আমার মতন লোকের সামনে বসে থাকতে আপনার বিরক্ত লাগে, আমি এখান থেকে উঠে যেতে পারি।

—সে কি কথা! মোটেই না! ও সব ধারণা অনুগ্রহ করে মনেই আনবেন না!

—বেশ, তাই যদি হয়···তাহলে আসুন, দুজনে মিলেই চা-পান করা যাক্···একটু কড়া হবে···চলবে তো?

এই বলে পদ্‌নিশেফ্ একটা পাত্রে খানিকটা চা ঢেলে দেয়।

—কথা বলতে হয় বলেই ওরা কথা বলে···কিন্তু ওদের সব কথা ভূয়ো···মিথ্যে···

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কোন্ কথা বলছেন?

—ঐ যে, যেকথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল···ঐ ওদের প্রেমের কথা আর তার আণুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?

—না, মোটেই না!

—বেশ, আপনার যদি বিরক্তি না লাগে, তাহলে শুনুন, ঐ যে-প্রেমের কথা ওঁরা বলছিলেন, ঐ প্রেমের জন্যেই আমি যা করেছি, তা করতে একরকম বাধ্য হই। শুনবেন?

—বিলক্ষণ! বিরক্ত হব কেন? যদি বলতে আপনার কোন কষ্ট না হয়,—

—মোটেই না। চুপ করে থাকাই কষ্টদায়ক। আর একটু চা নিন? খুব কড়া লাগছে কি?

সত্যিই চা-টা অসম্ভব রকম কড়া ছিল, প্রায় বিয়ারের মতন। কিন্তু পুরো একটা গ্লাস খেয়ে ফেল্লাম। ঠিক সেই সময় গার্ড মাঝখান দিয়ে চলে গেল। তাকে দেখেই পদ্‌নিশেফ্ বিরক্ত হয়ে তার সেই বিচিত্র আওয়াজ করে উঠলো। এবং যতক্ষণ সে চলে না গেল, ততক্ষণ কথা বন্ধ করে রইলো।

—বেশ, তা হলে, আমার কাহিনী আমি বলবো আপনাকে ···কিন্তু সত্যি আপনি বিরক্ত হবেন না তো?

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, আনন্দিতচিত্তেই আমি তার কাহিনী শুনবো। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর, দুহাত দিয়ে মুখটা একবার ভাল করে ঘষে নিয়ে বলতে স্থরু করে,

"বিয়ের আগে, অন্য পাঁচজনের মতই সমাজে আমাদের নিজের শ্রেণীর মধ্যেই বসবাস করতাম। অর্থাৎ আমি ছিলাম জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য এবং এক সময় আমার নামের সঙ্গে রীতিমত একটা রাজ-উপাধিও ছিল, মার্শাল অফ্ দি নোবল্স্। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের লোকেরা যেভাবে জীবনযাপন করে, আমিও সেইভাবে জীবনযাপন করতাম, অর্থাৎ নীতির কোন বালাই ছিল না এবং আমাদের দলের আর পাঁচজন যেমন ধরে নিয়েছিল যে সেভাবে জীবনযাপন করাই হলো স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, আমিও ঠিক তাই ভাবতাম। তাই নিজের সম্বন্ধে একটা উঁচু ধারণাই ছিল, মনে করতাম আমি একটা আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি এবং আমার চরিত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটী নেই। আমার সমবয়সী এবং আমার সমান মর্য্যাদা যাদের ছিল, তাদের অনেকের মত আমি আত্মসুখকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিই নি, কখনও কোন নারীকে স্বেচ্ছায় প্রলুব্ধ করে নষ্ট করি নি, কিম্বা কোন বিকৃত ক্ষুধাও আমার ছিল না। আমি যা কিছু পাপ করতাম, তা রীতিমত মেপে করতাম, স্বল্প মাত্রায় এবং ভদ্রভাবে, স্রেফ স্বাস্থ্যের জন্যে। যেসব স্ত্রীলোক

প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলতাম। অবশ্য, যতদূর মনে পড়ে, হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে একটু আধটু প্রেম এসেও গিয়েছিল কিন্তু আমি এমনই ব্যবহার ক'রতাম যেন আমি সে-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এবং এই ধরণের আচরণ যে নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই ছিল না; উপরন্তু নিজের আচরণে নিজে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করতাম।"

হঠাৎ এখানে এসে সে থেমে গেল এবং গলা দিয়ে সেই অদ্ভুত আওয়াজ করে উঠলো। বুঝলাম, যখনি তার মনে কোন নতুন আইডিয়া আসে, তখনই এই রকম অদ্ভুত শব্দ সে করে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু এইটেই ছিল আমার চরিত্রের আসল নীচতা। দেহগত ব্যাপারই সব কিছু নয়; যেখানে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, সেখানে নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করাই হলো অন্যায়। এই নৈতিক বন্ধনকে অস্বীকার করাই ছিল আমার প্রধান কৃতিত্ব। আমার মনে আছে, একবার একজন স্ত্রীলোককে যথারীতি অর্থ-উপহার দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারি নি বলে, কি নিদারুণ অস্বস্তিই না ভোগ করেছিলাম…সম্ভবত স্ত্রীলোকটী আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল। যতক্ষণ না তাকে কিছু টাকা গছাতে পারলাম, ততক্ষণ

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, আনন্দিতচিত্তেই আমি তার কাহিনী শুনবো। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর, ছুহাত দিয়ে মুখটা একবার ভাল করে ঘষে নিয়ে বলতে সুরু করে,

"বিয়ের আগে, অন্য পাঁচজনের মতই সমাজে আমাদের নিজের শ্রেণীর মধ্যেই বসবাস করতাম। অর্থাৎ আমি ছিলাম জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য এবং এক সময় আমার নামের সঙ্গে রীতিমত একটা রাজ-উপাধিও ছিল, মার্শাল অফ্ দি নোবল্‌স্। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের লোকেরা যেভাবে জীবনযাপন করে, আমিও সেইভাবে জীবনযাপন করতাম, অর্থাৎ নীতির কোন বালাই ছিল না এবং আমাদের দলের আর পাঁচজন যেমন ধরে নিয়েছিল যে সেভাবে জীবনযাপন করাই হলো স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, আমিও ঠিক তাই ভাবতাম। তাই নিজের সম্বন্ধে একটা উঁচু ধারণাই ছিল, মনে করতাম আমি একটা আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি এবং আমার চরিত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটী নেই। আমার সমবয়সী এবং আমার সমান মর্য্যাদা যাদের ছিল, তাদের অনেকের মত আমি আত্মসুখকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিই নি, কখনও কোন নারীকে স্বেচ্ছায় প্রলুব্ধ করে নষ্ট করি নি, কিম্বা কোন বিকৃত ক্ষুধাও আমার ছিল না। আমি যা কিছু পাপ করতাম, তা রীতিমত মেপে করতাম, স্বল্প মাত্রায় এবং ভদ্রভাবে, স্রেফ স্বাস্থ্যের জন্যে। যেসব স্ত্রীলোক

প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলতাম। অবশ্য, যতদূর মনে পড়ে, হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে একটু আধটু প্রেম এসেও গিয়েছিল কিন্তু আমি এমনই ব্যবহার ক'রতাম যেন আমি সে-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এবং এই ধরণের আচরণ যে নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই ছিল না; উপরন্তু নিজের আচরণে নিজে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করতাম।"

হঠাৎ এখানে এসে সে থেমে গেল এবং গলা দিয়ে সেই অদ্ভুত আওয়াজ করে উঠলো। বুঝলাম, যখনি তার মনে কোন নতুন আইডিয়া আসে, তখনই এই রকম অদ্ভুত শব্দ সে করে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু এইটেই ছিল আমার চরিত্রের আসল নীচতা। দেহগত ব্যাপারই সব কিছু নয়; যেখানে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, সেখানে নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করাই হলো অন্যায়। এই নৈতিক বন্ধনকে অস্বীকার করাই ছিল আমার প্রধান কৃতিত্ব। আমার মনে আছে, একবার একজন স্ত্রীলোককে যথারীতি অর্থ-উপহার দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারি নি বলে, কি নিদারুণ অস্বস্তিই না ভোগ করেছিলাম···সম্ভবত স্ত্রীলোকটী আমাকে ভালবেসে ফেলে-ছিল। যতক্ষণ না তাকে কিছু টাকা গছাতে পারলাম, ততক্ষণ

মনে এতটুকু শান্তি আনতে পারি নি। অর্থাৎ টাকাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে অতঃপর তার সম্বন্ধে কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার নেই।"

হঠাৎ সে জোর গলায় বলে উঠলো, "আমার মতের সঙ্গে আপনার যে মিল আছে, তা জানাবার জন্যে ঘাড় নাড়বার কোন দরকার নেই আপনার। আমি ভালরকমই জানি ঐ কায়দা। প্রত্যেক পুরুষমানুষ, তার মধ্যে আপনিও আছেন, অবশ্য জানি না আপনি যদি কোন অসাধারণ সাধু-পুরুষ হন্, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা, নতুবা আমি জানি সব পুরুষমানুষেরই ঐ মত। সব জায়গাতেই এই একই ব্যাপার। ক্ষমা করবেন আমাকে, কিন্তু এটা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর!

—কোন্‌টে ভয়ঙ্কর? জিজ্ঞাসা করে উঠি।

—স্ত্রীলোক এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে গভীর আত্ম-প্রবঞ্চনা আমরা করে চলেছি। সত্যি, এ বিষয়ে কোন কথা বলতে গেলে, আমি আর শান্ত হয়ে কথা বলতে পারি না। এমন একটা ব্যাপার একদিন ঘটে গেল, যা থেকে আমার চোখের পর্দ্দা খুলে গেল এবং তারপর থেকে আমি সমস্ত ব্যাপার এক আলাদা আলোতে দেখতে শিখি। যা কিছু ছিল, সব যেন উল্টে গেল···সম্পূর্ণ উল্টে গেল···

কথা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে আবার বলতে সুরু করলো। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। ট্রেণের অবিরাম

ঘড়্ ঘড়্ শব্দের ওপরে শুধু কাণে এসে লাগছে তার গুরুগম্ভীর মিঠে আওয়াজ···

(৪)

—"বিশ্বাস করুন, বহুদিন বহু মর্মবেদনা ভোগ করার পর, আমি বুঝতে পারলাম, এই অন্যায়ের মূল কোথায়। সেই যন্ত্রণা, সেই মর্মদাহ ভোগ না করলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। যেদিন থেকে জানতে পারলাম, কি করা উচিত, সেদিন থেকে নিঃসন্দেহভাবে বুঝলাম যা করেছি, তা কতখানি বীভৎস অন্যায়।

গোড়া থেকেই আপনাকে বলি, কখন কিভাবে সুরু হলো এই ব্যাপার, যার পরিণাম গিয়ে দাঁড়ালো আমার জীবনের সেই ভয়াবহ ঘটনায়। তখন আমার বয়স ষোলো পূরো হয় নি, আমি সেই মারাত্মক পথে প্রথম পা বাড়ালাম। তখনও আমি স্কুলের ছাত্র, আমার বড় ভাই কলেজে পড়ছে। এর আগে, স্ত্রীলোক কি তা আমি জানতাম না, তবে তাই বলে, আমি যে একেবারে নিষ্পাপ শিশুটী ছিলাম, তা-ও নয়। আমাদের সমাজের সেই বয়সের অধিকাংশ হতভাগ্য ছেলের মতন সে-দাবী করবার অধিকার তখনই আমি হারিয়েছি। প্রায় দু'বছর আগে আমার সঙ্গীদের কৃপায় আমার মন কলুষিত হয়ে গেয়েছিল, এবং স্ত্রীলোকের কথা ভাবতে গেলেই

আমার মন টন্‌টন্‌ করে উঠতো। অবশ্য কোন বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের চিন্তা তখনও জাগে নি, স্ত্রীলোকমাত্রেই আমার মনে একটা অস্বস্তি জাগাতো।

তাই, যখনই একলা থাকতাম, আমার মনে নানারকম কুৎসিত ভাবনা মূর্ত্তি ধরে উঠতো। আমাদের সমাজের শতকরা নিরানব্বুই জন ছেলে এই সম্পর্কে যেভাবে নিজেকে ক্ষয় করে, আমিও তাই করতে সুরু করে দিলাম। ভীষণ ভয় করতে লাগলো, মনে মনে রীতিমত যন্ত্রণা হতো, হাত জোড় করে কত প্রার্থনা করলাম, কিন্তু পতন আমার হলো। সুতরাং ইতিমধ্যেই আমি মনের দিক থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, অবশ্য আমি একাই নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিলাম। অন্য কাউকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে আমার অধোগতির সাথী করবার সুযোগ তখনও আসে নি।

এহেন মানসিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যখন চলেছি তখন আমার দাদার এক বন্ধু, স্ফূর্ত্তিবাজ ছোকরা, যাদের সাধারণত বলা হয়, চমৎকার ছেলে অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মা বদমায়েস, ইনি আমাদের মদ খেতে এবং জুয়ো খেলতে ইতিমধ্যেই দীক্ষা দিয়েছিলেন, একদিন রাত্রিবেলা সকলে মিলে মদ্যপান করার পর, আমাদের মন্ত্রণা দিলেন, চল্, আজ "সেখানে" যাবো। এবং আমরা গেলাম। আমার দাদাও সেরাত্রির আগে পর্য্যন্ত কলঙ্কহীনই ছিল, সে-রাত্রি তারও পতন হলো। ষোলো বছরের নাবালক আমি, কি করছি, তার ফলাফল কি,

তা না জেনেই সে-রাত্রি সকলের সঙ্গে অন্ধকার গহ্বরে নেমে পড়লাম।

"আমার যাঁরা গুরুজন ছিলেন, তাঁরা কেউ একবারও আমাকে সতর্ক করে দেন নি যে, আমি যা করছি তা অন্যায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, আজকের যুগের ছেলেদেরও সে-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় না। তবে যদি বলেন, বাই-বেলে দশম অনুজ্ঞাতে তা বলা হয়েছে, সেখানে আমার বক্তব্য হলো, স্কুলে ছেলেরা শুধু পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যেই তা মুখস্থ করে এবং তাও এমন কিছু নয় যে না পড়লে পাশ করা যাবে না কিংবা ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্রের মতন অপরিহার্য্যও নয়। অন্তত আমার বিষয়ে আমি বলতে পারি, আমার অভিভাবকরা কেউই আমাকে বলেন নি যে আমি যা করছি তা অন্যায়। বরঞ্চ উল্টে, যাঁদের আমি শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের মুখ থেকে শুনেছি যে আমি যা করচি, তা ঠিকই আছে। আমি জানতে পারলাম যদি কোন রকমে একবার এইভাবে বাসনা চরিতার্থ করতে পারি, তাহলে আমার সমস্ত ছটফটানি, সমস্ত যন্ত্রণা বিদূরিত হয়ে যাবে। একথা আমি লোকমুখে শুনেছি এবং বই-তেও পড়েছি। আমার অভিভাবকেরা কেউই বলতে আসেন নি যে, আমার সংবাদ ভুল। যে সব লোককে আমি চিনতাম, তারা তাদের কৃতকর্মকে একটা বীরত্বের সামিল মনে করতো। সুতরাং চারদিক থেকে একথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, একাজের ফল ভালই হবে। খারাপ কিছু হতে পারে, সে সম্বন্ধে

আমার কোন আশঙ্কাই কি ছিল না? খারাপ যা কিছু হতে পারে, তা আগে থাকতেই জানা থাকে এবং লোক-পালক পরম সদাশয় গভর্ণমেণ্ট সে-সম্বন্ধে ভেবে-চিন্তে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এই জাতীয় সমস্যা তত্ত্বাবধান করবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট থেকে মাইনে-করা ডাক্তার নিযুক্ত থাকে। খুবই উচিত ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যের পক্ষে কি দরকার তা একমাত্র ডাক্তারেরাই বলতে পারে এবং এই সামাজিক চরিত্রের পেছনে তাদেরই অনুমোদন থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এই জাতীয় ব্যাপারে, ডাক্তারেরা যে ব্যবস্থা দেয়, গর্ভধারিণীরা অকুণ্ঠভাবে তা পালন করে। বিজ্ঞানই এর জন্যে দায়ী।

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠি, কেন, বিজ্ঞান কিসে দায়ী?

সে উত্তর দেয়, বিজ্ঞান দায়ী নয়? ডাক্তারেরাই তো বিজ্ঞানের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখবার এই সব বিধানের প্রবর্ত্তন করে তাঁরা আমাদের যুবকদের জাহান্নামে টেনে নিয়ে চলেছেন! তাঁদের নাহলে যেন দুনিয়া চলবে না, এমন একটা ভঙ্গী করে তাঁরা রোগ নিরাময় করে চলেছেন!

জিজ্ঞাসা করি, রোগ নিরাময় করাতে কি অপরাধ হলো?

—কি অপরাধ হলো শুনবেন? রোগের চিকিৎসা করতে তাঁরা যে পরিশ্রমটা করেন, তার শতভাগের একভাগ যদি তাঁরা প্রয়োগ করতেন, সমাজ থেকে এই সব অন্যায় আবদার

টেনে দূর করে ফেলে দেবার জন্যে, তাহলে বহু দিন আগেই এই সব রোগ অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিন্তু তা নয়। এই সমস্ত অন্যায়ের মূলোৎপাটন করবার জন্যে নয়, যারা অন্যায় করবে তারা যাতে এই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, তারই গ্যারাণ্টি দেবার জন্যে তাঁরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করছেন। তার ফলে, এই অন্যায় বেঁচে থাকবারই প্রেরণা পাচ্ছে। কিন্তু যে-কথা আমি বলতে চাইছি, এ তা নয়। আমি যে-কথা আপনাকে বিশেষ করে বোঝাতে চাইছি, সেটা হলো, আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল, দশ-ভাগের ন-ভাগ লোকের ভাগ্যে ঠিক তাই-ই ঘটে এবং শুধু যে তা আমাদের শ্রেণীতেই, তা নয়, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক স্তরে, এমন কি চাষাদের মধ্যেও আজ তা সংক্রমিত হয়েছে। আমি যে যৌবনের স্বভাবসুলভ প্রেমের দোহাই দিয়ে আত্ম-প্রবঞ্চনা করতে পারবো, তারও সম্ভাবনা ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমার যে পতন হলো, তার মূলে প্রেম বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। তার মূলে ছিল, যাঁদের মধ্যে আমি বাস করতাম, যাঁদের শ্রদ্ধেয় বলে জানতাম, তাঁদেরই প্রভাব। যে কারণে আমি নিজেকে অধঃপতিত মনে করি, তাঁরা সে কারণটাকে সম্পূর্ণ বৈধ এবং প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং কেউ কেউ তাকে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে শুধু যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতেন না, তা নয়, তাঁরা মনে করতেন তরুণ যুবকের পক্ষে ও-টা একান্ত নির্দ্দোষ একটা খেলা। সুতরাং, একথা তখন আমার মনেই

আসে নি যে, সেই ঘটনা থেকে আমার অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেমন সহজ ভাবে আমি সিগারেট খেতে বা মদ্যপান করতে শিখি, তেমনি সহজ ভাবেই ধরে নিয়েছিলাম যে এটা-ও খানিকটা আনন্দের এবং খানিকটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু সেদিন সেই প্রথম রাত্রিতে, জীবনের সেই প্রথম পাপাচরণে আমার মনে কোথা থেকে একটা রহস্যময় বেদনার অনুভূতি জাগে। আমার মনে আছে, যে-মুহূর্ত্তে আমার কামনা নিঃশেষিত হয়ে গেল, আমি কেমন যেন অবর্ণনীয় এক বিষাদে অভিভূত হয়ে পড়লাম, মনে হলো খানিকটা যেন ডাক ছেড়ে কাঁদি। সত্যি, সেদিন আমার সেই শৈশব-সুপবিত্রতার অপমৃত্যুতে যদি প্রাণ-ভরে কাঁদতে পারতাম! সেদিন প্রাণে যে ময়লা দাগ কেটে গেল, জানি শতাব্দীর জলধারায় তা আর ধুয়ে শুভ্র করা যাবে না।

যাঁরা পবিত্র, যাঁরা নিষ্পাপ, তাঁরা যে-সহজ দৃষ্টিতে নারীকে গ্রহণ করতে পারেন, সেদিন হতে আমার নয়ন থেকে সে-দৃষ্টি চলে গেল। যারা আফিঙ খায়, যারা মাতাল, যারা দিবারাত্র তামাক টানে, তারা যেমন আর জীবনে কখনও স্বাভাবিক হতে পারে না, তেমনি যারা আমার মতন অধঃপতিত হয়, তারাও জীবনে আর সহজ হতে পারে না। তাদের মনে তখন ময়লা ছোপ পড়ে যায়। যে আফিঙ-খোর বা মাতাল, তার চোখ-মুখ, ভঙ্গী বা ব্যবহার দেখলেই যেমন তা বোঝা যায়, তেমনি যারা

অধঃপতিত তাদেরও মুখ-চোখ দেখলেই তাদের চেনা যায়। ক্রমশ তাদের হাব-ভাব বদলাতে বদলাতে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। হয়ত কেউ-কেউ চেষ্টা করে মোটামুটি লক্ষণগুলো চেপে রেখে খানিকটা আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়ত নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে কিন্তু নারী-জাতির সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা উচিত, যে-সম্পর্ক আমরা দেখি সহোদর আর সহোদরার মধ্যে, সেই সহজ, সুন্দর সুমধুর সম্পর্ক আর সে কোনমতেই ফিরে পায় না।

ক্রমশ আমি কামুক হয়ে উঠলাম এবং কামুকই রয়ে গেলাম। সেই কামুকতা নিয়ে এলো আমার সর্বশেষ সর্বনাশ…

সেই রাত্রির ঘটনার পর আমি একটু একটু করে গভীর-তর পাঁকে ডুবে যেতে লাগলাম। এখানে মনে রাখবেন, আমি যে সব অনাচারের কথা বলছি, সে শুধু আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছিল সেই সম্পর্কেই! আমার সঙ্গীরা কিন্তু আমাকে কতকটা নিষ্পাপ শিশু মনে করতো এবং তার জন্যে তারা অনবরত আমাকে বিদ্রূপও করতো। সেই বিদ্রূপের মধ্যে রীতিমত ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যও মেশানো থাকতো। কিন্তু আমার কাহিনীর পরিবর্তে যদি শুনতেন, এ যুগের ধনীর দুলাল যুবকদের কথা, প্যারিসবাসীদের কথা, না জানি আপনি কি ভাবতেন! অথচ এই জাতীয় ব্যাভিচারীর দল, তার মধ্যে আমি নিজেকেও বাদ দিচ্ছি না, যাদের ভেতরটা হাজার রকম

পাপের হাজার রকম দাগে বীভৎস হয়ে উঠেছে, দিব্যি সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত পোষাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে, সুন্দর করে দাড়ি-গোঁপ কামিয়ে, অঙ্গে সুবাস মেখে, কেমন স্বচ্ছন্দে ভদ্র-সমাজে উৎসব-সভায়, সান্ধ্য-আসরে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, যেন পবিত্রতার জীবন্ত সব মূর্ত্তি! কি চমৎকার!

একবার কল্পনা করে দেখুন, আজকাল সমাজে কি ব্যাপার ঘটছে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, কি হওয়া উচিত ছিল। কি হওয়া উচিত জানেন? যদি আমার বাড়ীতে, এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক সান্ধ্য-উৎসবে এসে হাজির হন এবং আমার ভগ্নী বা কন্যার সঙ্গে যদি দেখি আলাপ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাহলে আমার উচিত, তাঁকে ভালভাবে জানি বলেই, তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আড়ালে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে বলা, বন্ধু, আমি জানি কি ভাবে আপনি জীবন যাপন করেন, রাত্রিবেলায় কোথায় কাদের সঙ্গে আপনি বাস করেন তা আমার অজানা নেই...এ জায়গা আপনার উপযুক্ত বিচরণ-ক্ষেত্র নয়। এখানে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ কুমারী মেয়েরা রয়েছেন, অতএব, দূর হোন্!...এই জিনিসটীই হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে যা হয়, সেটাও শুনুন। এই জাতীয় কোন লোক যখন আমার বাড়ীতে এসে আমার ভগ্নী বা কন্যার কোমর জড়িয়ে ধরে নৃত্য করেন, তখন যদি আমি জানি সে লোকটী ধনবান্ এবং প্রতিপত্তিশালী, তাহলে আমরা সে-দৃশ্য দেখে আনন্দে হেসে উঠি। কি নিদারুণ লজ্জার

কথা! আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে যেদিন এই ভয়াবহ সামাজিক প্রবঞ্চনা, এই জঘন্য মিথ্যার জাল ছিন্ন করে পাপমুক্ত হতে পারবে সমাজ ?”

থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় উপর্যুপরি সেই বিচিত্র আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর একবার চা তৈরী করলো। সত্যি কথা বলতে কি এ রকম কড়া চা আমি ইতিপূর্বে আর খাই নি, কাছে কোথাও জল পাবারও সম্ভাবনা ছিল না যে মিশিয়ে পাতলা করে নেবো। দুপাত্র যা খেয়েছিলাম, তাতেই আমার শরীর যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। যত চা খেতে লাগলো, ততই যেন সে গরম হয়ে উঠতে লাগলো। তার কণ্ঠস্বর আরো যেন মোলায়েম আর তাজা হয়ে উঠলো। এক জায়গায় স্থির হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারছিল না। এখান থেকে সেখানে উঠে আবার সেখান থেকে আমার পাশে এসে বসছিল। কখনও টুপিটা মাথা থেকে খুলে পাশে রাখে, আবার কখন তুলে নিয়ে মাথায় দেয়। গাড়ীর ভেতর অন্ধকার আরো যেন নিবিড় হয়ে উঠে। সেই নিবিড়তর অন্ধকারে মনে হয়, তার মুখের চেহারা যেন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছিল।

সে আবার বলতে সুরু করে, এইভাবে ক্রমশঃ আমার বয়স ত্রিশ হয়ে এলো। বহুদিন থেকে মনে সাধ ছিল, বিবাহ করে সংসারী হবো এবং যতদূর সম্ভব পবিত্রভাবে সাংসারিক

জীবনযাপন করবো। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে-আশা মন থেকে নির্বাসিত করি নি। এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে, একটী বিবাহযোগ্যা তরুণী মেয়ে সযত্নে সন্ধান করে ফিরছিলাম। আমার স্ত্রীর সৌভাগ্য যে নারীর হবে, তাকে সন্দেহাতীতভাবে নিষ্কলুষ হতে হবে, তাই একান্ত সতর্কভাবেই মেয়ে বাছতে সুরু করলাম। অনেক মেয়েরই সন্ধান পেলাম কিন্তু তারা কেউই আমার উপযুক্ত অমলিন বলে মনে হলো না, তাই তাদের অবজ্ঞাভরেই প্রত্যাখ্যান করি। অবশেষে একদিন আমার অনুসন্ধান জয়যুক্ত হলো···এমন একজনের দেখা পেলাম, আমার বিবেচনায় যে সত্যিই আমার উপযুক্ত অমলিন বলে মনে হলো।

পেন্‌জার এক জমিদারের দুই মেয়ে ছিল, তার মধ্যে একটী সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এক সময় জমিদারের অবস্থা খুবই ভাল ছিল কিন্তু ইদানীং ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে খুবই বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে আর আমি নদীতে বোটে করে বেড়াচ্ছিলাম। সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এলো, চাঁদের অস্পষ্ট কোমল আলো নদীর জলে এসে পড়েছে, সেই আলোয় পথ দেখে বাড়ী ফিরছি, সে আমার পাশেই বসে আছে··· হঠাৎ সেই সন্ধ্যার আলোয় তার কুঞ্চিত কেশদামের দিকে চেয়ে, তার আঁট-করে-পরা জামার ভেতর থেকে সুগঠিত দেহের যৌবন-রেখা মনে হলো অপূর্ব, অনিন্দ্যসুন্দর।

মুগ্ধ-আনন্দে সে-কথা তাকে প্রকাশ করে জানাতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, যাকে খুঁজছি, এই সেই নারী। আমি বুঝতে পারলাম, সে-রাত্রি আমি যা কিছু অনুভব করেছি, তার প্রত্যেকটী স্পন্দন পর্য্যন্ত সে যেন অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এবং সে-রাত্রি আমার মনে যে-চিন্তা বা যে অনুভূতির স্পন্দন জেগেছিল, আমার ধারণায় তা দিব্য মহান্ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু আসলে যে-বস্তু আমার কল্পনার মূলে ছিল, সে হলো তার কুঞ্চিত কেশদাম, তার সেই অঙ্গ-লীন আবরণ, আর তার ঘনতর সান্নিধ্যের লোভ।

সৌন্দর্য্য আর শুচিতা যে এক, একথা যারা কল্পনা করে তারা যে কতখানি বিভ্রান্ত, তা কে বলবে ? সুন্দরী স্ত্রীলোক, যতক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকে, ততক্ষণই ভাল। যখন তারা কথা বলে, অপদার্থ কথাই বলে, কিন্তু আমরা তা শুনেও শুনতে পাই না· ·আমাদের কাণে তখন মধু-বর্ষণ করতে থাকে। যত অপদার্থ কথাই বলুক, যত জঘন্য কাজই করুক, তবু কি একটা আনন্দ-পাবার মোহ সে-সম্বন্ধে আমাদের অচেতন করে রাখে। যদি কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক এই জাতীয় কোন কথা বা কাজ সযত্নে এড়িয়ে চলে, আর সেই সঙ্গে সে যদি সুন্দরী হয়, তাহলে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করে নিই যে, উক্ত মহিলা নীতি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিও সেই বিশ্বাসে বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে সে-রাত্রি বাড়ী ফিরলাম, স্থির বিশ্বাস হলো যে, সে-নারী শুধু সুন্দরীই নয়, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়া

সুতরাং আমার পত্নী হবার যোগ্যা। পরের দিনই আমি বিবাহের প্রস্তাব করলাম।

ভাবের কি বিচিত্র গোঁজামিল! শুধু আমাদের সমাজেই নয়, জনসাধারণের মধ্যে যে কোন স্তরেই, হাজার-করা যত লোক বিয়ে করে, তার মধ্যে এমন একজনও থাকে না যে, ডন জুয়ানের মত বিয়ের রাত্রির আগে বহু-বিবাহিত-রাত্রির স্বাদ না ভোগ করেছে। একথা অবশ্যি সত্য যে, এখন নাকি এমন অনেক যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, সে-কথা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও জানি, যারা সতীত্বকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে এবং মনে করে না যে সেটা একটা উপহাসের বস্তু। ভগবান তাদের ভাল করুন! কিন্তু আমাদের সময় দশ হাজার যুবকের মধ্যে এই রকম একটীকেও পাওয়া যেতো না। প্রত্যেকেই বেশ ভালরকম করেই জানে এই হলো আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু তবুও সকলে একথা মন থেকে স্বীকার করবে না।

প্রত্যেক নভেল খুলে দেখুন, দেখবেন নায়কের মনস্তত্ত্বের তন্নতন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে সেখানে, যে সব বন-উপবন বা নদ-নদীর ধার দিয়ে এইসব নায়ক বিচরণ করে, তাদেরও নিখুঁত বর্ণনা দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন সেই নায়কের প্রেম বর্ণনা করা হয়, তখন একবারও কেউ ভুলে লেখে না যে, সেই নায়কের সে-সম্পর্কে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল কি না। অথবা যদি এই জাতীয় কোন নভেল সত্যিই থাকে, তাহলে

প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়, যাতে সে-নভেল তরুণীদের হাতে না যায়। প্রথমত একটা অজুহাত তাদের সামনে উপস্থিত করা হয় যে, যে-অনাচারের আগুনে শহর-বাসী বা গ্রাম্য লোকদের অর্দ্ধেক জীবন জ্বলে পুড়ে আজ ক্ষার হয়ে যাচ্ছে, সে-জিনিসটাই নাকি মিথ্যে, অর্থাৎ বাস্তব-জগতে তার নাকি অস্তিত্বই নেই। কালক্রমে এই ছলনায় আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে, আমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি যে আমরা সকলেই সাধু পুরুষ এবং আমরা যে-জগতে বাস করছি, তার মাটীতে এসব অনাচার জন্মায় না। একান্ত দুঃখের বিষয়, সকলের চেয়ে বেশী করে এবং একান্ত সত্য বলে এই জিনিসটা মেনে নেয়, বেচারা মেয়েরা। আমার হতভাগ্য সহধর্ম্মিণীরও সেই বিশ্বাস ছিল। বিয়ের পর, বিয়ের আগে পর্য্যন্ত লেখা আমার ডায়রী তাঁকে দেখালাম। তা থেকে আমার পূর্ব-জীবনের আভাস তিনি খানিকটা পাবেন। বস্তুত তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার যে-ঘটনা ঘটে ডায়রীর শেষের দিকে তার উল্লেখ ছিল। বাইরে থেকে অপরের মুখে শোনার চেয়ে আমি ভেবেছিলাম নিজে থেকেই জানানো ভাল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ডায়রী পড়ে সেই সব ব্যাপার যে আমি সত্যি করেছি, তা জেনে, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে এবং হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়েন। মনে হলো যেন আমার সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তেই সকল সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করতে চান।

জিজ্ঞাসা করে উঠি, তা থেকে তিনি বিরত থাকলেন কেন? আবার গলায় সেই অদ্ভুত আওয়াজ করে কিছুক্ষণের জন্যে ভদ্রলোক চুপ করে রইলো। দু'এক চুমুক চা খেয়ে নিল। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো, তা যদি হতো, তো ভালই ছিল···আমার উপযুক্ত শাস্তি হতো···

(৬)

"কিন্তু আসল কথা তা নয়। আমার বক্তব্য হলো, এই জাতীয় ব্যাপারে, মেয়েরাই সত্য সত্য প্রতারিত হয়। তাঁদের স্বামীদের কাছ থেকেই এ যুগের মেয়েদের মায়েরা প্রথম নষ্ট হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটা জেনে যায় কিন্তু জানা সত্বেও, তাঁরা ন্যাকা সেজে থাকেন, যেন পুরুষ মানুষেরা অন্যায় কি তা জানে না। অথচ তাঁরা নিজেরাই এমন সব ব্যবহার করেন, যার সঙ্গে তাঁদের সেই ধারণার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কোথায় কখন কি টোপ ফেল্লে তাঁদের নিজেদের জন্যে এবং তাঁদের কন্যাদের জন্যে মানুষ ধরতে পারা যায়, তা তাঁরা ভাল রকমই জানেন।

মেয়েরা খুব ভালরকম ভাবেই জানে, যাকে সাধারণত আমরা বলি, কাব্যিক প্রেম, চির-জীবনের প্রেম, তা কোন নৈতিক গুণের উপর নির্ভর করেনা, সে-প্রেম জন্মায় প্রয়োজন মত ঘন-ঘন দেখাশোনার ওপর, যে ষ্টাইলে চুল

প্রসাধন করা হয়, যে ছাঁদে পোষাকের কাট তৈরী হয়, তারই ওপর। প্রমাণ স্বরূপ, যে কোন অভিজ্ঞ "কোকেট" স্ত্রীলোকের সামনে এই সমস্যাটি উপস্থিত করে, তার জবাব শুনতে চান,—ছুটি কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে যদি তাকে পড়তে হয়, প্রথম পরিস্থিতি হলো, যে লোকটীকে সে আকর্ষণ করতে চাইছে, তার সামনে একজন প্রমাণিত করে দিল যে, সে হৃদয়হীনা, প্রবঞ্চনাকারিণী, এমন কি চরিত্রহীনা। দ্বিতীয় পরিস্থিতি হলো, যে লোকটীকে সে আকর্ষণ করতে চাইছে তার সামনে একটা সেকেলে-ধরণের অতি কুৎসিত পোষাকে তাকে আবির্ভূত হতে হবে। জিজ্ঞাসা করুন তাকে, এই ছুটী পরিস্থিতির মধ্যে সে কোন্‌টীকে বরণ করতে বাধ্য হতে পারে? বিনা দ্বিধায় সে প্রথম পরিস্থিতিকেই গ্রহণ করবে। তার কারণ, সে-নারী ভাল করেই জানে, পুরুষরা মুখে যে-সব বড় বড় ভাবের কথা উচ্চারণ করে, মনে তা তারা আদৌ বিশ্বাস করে না, এবং নারী-সম্পর্কে তারা যা চায়, তা শুধু স্রেফ্‌ সেই নারীর দেহটী, তাই তারা মেয়েদের মধ্যে যে কোন উচ্চভাবের অভাব দেখুক, সে সম্বন্ধে তারা সর্ব্বদাই ক্ষমা করতে প্রস্তুত কিন্তু তাদের দেহকে যাতে অশোভন দেখায়, কুৎসিৎ দেখায়, তা তারা সহ্য করতে চায় না। প্রত্যেক কোকেট্‌ নারী সচেতন ভাবে এই কথাটা জানে, প্রত্যেক নিরীহ তরুণী অচেতন ভাবে তা উপলব্ধি করে। তাই স্ত্রীলোকের পোষাকে আজকাল দেখতে পান, জামার পেছন দিকটা এমন ভাবে কাটা যে পিঠের অংশ-বিশেষ নগ্ন

দেখা যায়, জামার সামনের অংশ এমনভাবে তৈরী যে, কাঁধ, হাত, এমন কি বক্ষসীমান্ত পর্য্যন্ত মুক্ত দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা পুরুষদের পাঠশালায় পাস করে বেরিয়েছেন, তাঁরা ভালরকম ভাবেই জানেন, পুরুষের মুখে ভাবের উচ্চ আলোচনা একান্ত শূন্যগর্ভ আওয়াজ, পুরুষের কামনার একমাত্র লক্ষ্য হল নারী-দেহ এবং যা কিছু সেই দেহকে মোহনীয় করে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। এবং এই দিব্য জ্ঞানের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে সামঞ্জস্য রেখে তারা যা কিছু করবার তা করে।

আজ যে সব চিরাচরিত রীতি-নীতি আর অভ্যাস আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে, যদি সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সত্যিকারের ভেবে দেখি, আমাদের সমাজের যাঁরা শীর্ষ-স্থানীয়, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করে চলেছেন, তাহলে দেখবো যে, তা পুরোমাত্রায় জঘন্য। আপনি সে-কথা বিশ্বাস করেন না? বেশ, আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

আপনার ধারণা, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা যে সব সুবিধা সুযোগের অন্বেষণ করেন, তার সঙ্গে বারবিলাসিনীদের রীতি-নীতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনি শুনুন, আপনার সে-ধারণা ভুল···এবং আমি যে কেন এত বড় একটা কথা বলছি, তা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

জীবনের লক্ষ্য যাদের স্বতন্ত্র, যারা এই মানবীয় অস্তিত্বের একটা স্বতন্ত্র মূল্য ধার্য্য করতে শিখেছে, তাদের সমস্ত কাজ

কর্ম্ম, তাদের বাইরের সমস্ত সাজ-সজ্জা আয়োজনের মধ্যে সেই অনুযায়ী একটা সঙ্গতি নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সেই সূত্র অনুযায়ী আমাদের সমাজের উচ্চস্তরের যাঁরা স্ত্রীলোক, তাঁদের সঙ্গে হতভাগ্য পতিত নারী-কুলের তুলনা করে দেখুন। কি দেখতে পাচ্ছেন ? সেই প্রসাধন, সেই অঙ্গরাগ, সেই ল্যাভেণ্ডার আর গোলাপে সুবাসিত দেহ, সেই অর্দ্ধ-নগ্ন বক্ষ, উন্মুক্ত বাহু আর স্কন্ধ, সেই পেছনদিককার-পিঠ-খোলা জামার আমন্ত্রণ, সেই হীরে-জহরতের লোভ, সেই চাকচিক্যময় অলঙ্কারের মোহ, সেই নিভৃত উল্লাস, সেই সঙ্গীত, নৃত্য, আলো...বারবনিতারা যেমন এই সব জিনিসের সাহায্যে পুরুষকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, তাঁরাও ঠিক তাই-ই করেন। কোন প্রভেদ নেই উদ্দেশ্য আর প্রয়োগ-কলায়।

(৭)

"অতঃপর সেই পিঠ-কাটা জামা, সেই কুঞ্চিত অলকদাম, সেই অর্দ্ধ-নগ্ন দেহ-রেখার জালে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। শহরে যেমন আগুনের আঁচে অসময়ে ফল পাকায়, আমিও তেমনি যে পরিবেশের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলাম, তাতে বয়স হওয়ার আগেই তরুণ প্রেমিক রূপে পরিপক্ক হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সুতরাং আমাকে জালে ফেলা খুব সহজ ব্যাপারই ছিল। বরাতগুণে দুবেলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেসব খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, এবং সে-খাদ্য রীতিমত দেহের উত্তাপ-

বর্দ্ধক, তার সঙ্গে যোগ করুন আমাদের ষোল-আনা দৈহিক অকর্ম্মণ্যতা। তার যোগফল কি হতে পারে, একবার ভেবে দেখুন!

আপনি হয়ত শুনে বিস্মিত হচ্ছেন বা হচ্ছেন না, তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু কথাটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতন। আমিও যে তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তা নয়। ইদানীং মাত্র আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এবং আমার চারদিকে যখন চেয়ে দেখি, সবাই এই সহজ সত্যটী সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, তখন সত্যিই গভীর বেদনায় অন্তর মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

গত বসন্ত কালে আমাদের অঞ্চলে এক রেলের বাঁধের ওপর একদল চাষী কাজ করছিল। সাধারণ একজন বলিষ্ঠ চাষী, যখন তার ক্ষেতে অল্পস্বল্প পরিশ্রম করে তখন তার খাদ্য হিসাবে সে গ্রহণ করে, রুটী আর পেঁয়াজ এবং তাতেই সে বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ এবং সুস্থ থাকে। যখন রেলে কাজ করতে আসে তখন সে কোম্পানীর কাছ থেকে খাদ্য হিসাবে পায়, খানিকটা পোরিজ আর দিনে আধ-সের টাক মাংস। এই যে আধ-সের মাংস সে খায়, তার দরুণ দিনে ষোলোঘণ্টা সে খাটে, তার মাংস-পেশী যতদূর বইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত বোঝার ভার তাকে বইতে হয়। আর আমরা, বাড়ীতে বসে, শীকারের পাখী, মাছ, মাংস, পর্য্যাপ্তভাবে তার সঙ্গে আরো নানান রকমের শরীর-গরম-করা খাদ্য নিয়মিত গ্রহণ করে থাকি, এবং তার সঙ্গে থাকে মদ। এখন আমার জিজ্ঞাস্য

হলো, এত সব খাদ্য হয় কি ? দেহের কোন স্বাভাবিক কর্ম দরুণ, এই সব খাদ্য দেহের মধ্যে অতিরিক্ত উত্তাপের সৃষ্টি করে, অস্বাভাবিক উত্তেজনা জাগায় ; সেই উত্তাপ আর উত্তেজনা আমাদের অপ্রাকৃত অলস জীবনের মধ্যে দিয়ে তার মুক্তিপথ অন্বেষণ করে এবং তারই ফলে আমরা প্রেমে পড়তে থাকি।

সুতরাং আমিও প্রেমে পড়লাম, যেমন আর পাঁচজন পড়ে এবং প্রেমে পড়লে যে-সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আমাকেও তার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো। গভীর উচ্ছ্বাস, ভালবাসা, দীর্ঘশ্বাস, কবিতা, সবই লক্ষণ-অনুযায়ী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আসলে প্রেমের সংঘটন হলো, একদিকে মেয়ের মায়ের কলা-কৌশল আর একদিকে দরজীর জামা তৈরী করবার কায়দা ; একদিকে টেবিল-ভর্ত্তি ডিনার, আর একদিকে জীবন-ভরা আলস্য। যদি মেয়ের মা আমার সঙ্গে মেয়েকে বিনা-দ্বিধায় বোটে সান্ধ্য-ভ্রমণ করতে না ছেড়ে দিতেন, যদি দরজীরা রাত-জেগে সরু কোমরের নীচে এবং ওপরে দেহ-রেখা-গুলো স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলার জন্যেই পোষাক তৈরী না করতো ; যদি আমার স্ত্রী সাধারণ গাউনে সহজভাবে বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসতেন ; আর আমার দিক্ থেকে যদি আমি সহজ স্বাভাবিক কর্ম্মময় জীবন যাপন করবার শিক্ষা পেতাম, তাহলে আমার প্রেমে পড়বারও কোন প্রয়োজন হতো না এবং তার ফলে আনুষঙ্গিক যে সব ঘটনা ঘটলো, তাও ঘটবার কোন অবকাশই থাকতো না।

"এখন আসল ব্যাপারে আসা যাক্। সে-সময় আমার যা মনের অবস্থা ছিল, তার সঙ্গে সেই বোটে সান্ধ্য-বিহার এবং চোখের সামনে সেই কাম-উদ্রেককারী সজ্জা, সমস্ত মিলে ব্যাপারটাকে বেশ পাকিয়ে তুল্লো। এর পূর্ব্বে ঠিক এই রকম যোগাযোগ হয়ত আরো কুড়িবার সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার মনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি। এবার কিন্তু যোগাযোগটা সার্থক হয়ে উঠলো এবং আমি রীতিমত একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেলাম।

আমি যদি বলি, আজকাল যেভাবে বিবাহের আয়োজন করা হয়, সেটা ফাঁদ পাতারই সামিল, মনে করবেন না যে আমি রহস্য করছি। আজকাল যেভাবে বিবাহের আয়োজন হয়, তার মধ্যে সহজ স্বাভাবিকতা কোথায়? মেয়ে বড় হলো, তার বিয়ে দিতে হবে। যদি সে-মেয়ে একেবারে হত-কুৎসিত না হয়, তাহলে এর মধ্যে বিশেষ সমস্যা আর কি আছে? অসংখ্য পুরুষও রয়েছে, যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক। সেকালে তাই, এ নিয়ে বিশেষ কোন হাঙ্গামা হতো না। মেয়ে বয়স্কা হলে, বাপ-মা পাত্রের অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা করতেন। এখনও পর্য্যন্ত সেই ভাবেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, চীনেদের মধ্যে ভারতবাসীদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে, নিম্নশ্রেণীর রাশিয়ানদের মধ্যে, অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বুই ভাগের লোকদের মধ্যে এইভাবেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে চলেছে। এই একশো ভাগের এক ভাগ লোকের

কিংবা তার চেয়েও কম, এক শ্রেণীর অধঃপতিত লোকদের মগজে হঠাৎ একটা ধারণা গজিয়ে উঠলো যে এইভাবে এই সমস্যার সমাধান ঠিক হচ্ছে না, একটা নতুন কিছু ব্যবস্থা বার করতে হবে। এবং তাঁরা যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করলেন, তার বিশেষত্ব কি হলো? মেয়েরা সেজে-গুজে বসে থাকে, বিবাহার্থী যুবকেরা, বাজারে সওদা কিনতে আসার মতন, তাদের কাছে আসা-যাওয়া সুরু করে। তাদের মধ্যে একজনকে তাকে বেছে নিতে হবে। মেয়েরা ভয়ে-ভাবনায় চুপটী করে বসে থাকে, ইচ্ছে গেলেও মুখ ফুটে বলতে পারে না, ওগো, আমাকে নিয়ে যাও; ওকে নয়, দোহাই তোমার, আমাকে নিয়ে যাও, দেখ না, আমার কাঁধ কি রকম নরম, গোল··· আমার কোমর কি রকম সরু! ইতিমধ্যে আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা নিয়মিত ঘোরাফেরা করি, তাদের বাছাই করে দেখি এবং প্রত্যেকে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি এই ভেবে যে, আর যে-কেউই ফাঁদে পড়ুক আমি ফাঁদে পড়ছি না বাবা! এইভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাফেরা করি, সব বন্দোবস্ত মনের মতন হওয়ার দরুণ খুশীই হই, তার মধ্যে হঠাৎ কখন একজন না একজন ছ'কদম এগিয়ে যায় এবং ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি চান? আপনি কি চান, মেয়েরাই এগিয়ে এসে ছেলেদের কাছে প্রস্তাব করবে?

তিনি উত্তর দেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি কি চাই, তা

আমি জানি না···শুধু এই কথাটাই মনে হয়, যদি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারই বজায় রাখতে হয়, তা হলে সে অধিকারটা যেন উভয়ত সত্যিই সমান হয়!

"যদি পেশাদার ঘটকদের দিয়ে বিবাহের আয়োজন আজ মনে হয় অপমানজনক, তাহলে বলবো, তার পরিবর্ত্তে যে-ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি, তা তার চেয়ে হাজার গুণ অপমানজনক। পুরানো ব্যবস্থায় অধিকারই বলুন বা ভাগ্যই বলুন, উভয় পক্ষেই সমান ছিল, কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় মেয়ের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বাজারে বিক্রীর ক্রীতদাসীর মতন, কিংবা শুধুই একটা লুটের জিনিস।

"কোন মেয়ের মাকে বা সেই মেয়েকেই তার মুখের সামনে সোজা সত্যি কথাটা বলুন দেখি, তাদের এই সমস্ত আয়োজন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী নামক একটী জীবকে কোন রকমে ফাঁদে ধরা! ব্যস্! তাহলেই গিয়েছেন আর কি! এত বড় অপমান তাঁদের কি সাহসে আপনি করতে পারেন? অথচ তাঁরা সকলেই তাই করে চলেছেন এবং তাছাড়া তাঁদের করবারও আর কিছুই নেই। সত্যি যখন দেখি, একান্ত অল্প বয়সের নিরীহ সব ছোট-ছোট মেয়েরা এইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, মনে ভয়াবহ আতঙ্ক জেগে ওঠে। একেই তো ব্যাপারটা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়, তবুও যদি সেটা প্রকাশ্যভাবেই জেনে শুনে সোজাসুজী করা হতো, তাহলে এত কুৎসিত লাগতো না। আগাগোড়া ব্যাপারটা একটা জঘন্য প্রবঞ্চনা!

"কোন মেয়ের মা হয়ত গদগদকণ্ঠে বলে উঠলেন, ও হো! "দি অরিজন্ অফ্ স্পিসিস্" ! *

—আমার লিলি, উঃ, ছবি আঁকতে কি যে ভালবাসে!

—কি, এক্‌জিবিশনে একবার তোমরা দুজনে ঘুরে বেড়িয়ে আসবে নাকি? সত্যি, কত কি যে শেখা যায় সেখানে! ট্রেয়কাতে চড়া, কি মজা! তারপর থিয়েটার, কনসার্ট, সত্যি, চমৎকার!

—আমার লিলি, গানের জন্যে একেবারে পাগল!

—ওমা! সে কি কথা! এ হতে পারে না, নিশ্চয়ই তোমারও সেই মত!

—বোটে করে সন্ধ্যাবেলায় বেড়ানো! ও হো...সে তো অপূর্ব্ব, সত্যি অপূর্ব্ব!

এই সব উচ্ছ্বাসের পেছনে যে মনোভাবটী উহ্য থাকে, সর্বক্ষেত্রেই সেটী এক। ভাষায় রূপ দিলে সেটা এই দাঁড়ায়,

—ওগো, আমাকে নাও, দয়া করে আমাকে নাও!

—না, কিছু শুনবো না, আমাকে নিতেই হবে!

---

* ডারউইনের লেখা জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, যে গ্রন্থ থেকে সুরু হলো নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারা, যে জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবান্ বলে কিছু নেই, এই জড় জগৎ ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা, অনুযায়ী স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছে; সে-যুগের শিক্ষিত লোকদের স্থানে-অস্থানে এই বইখানির নাম উচ্চারণ করা একটা ফ্যাসান ছিল, যেন তা দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাইতেন যে তাঁরা প্রগতিশীল এবং উচ্চ-শিক্ষিত।

—আমার লিলিকে তুমি নাও।

জঘন্য, যাচ্ছেতাই মিথ্যাচার!”

ইতিমধ্যে পাত্রের চা ফুরিয়ে যায়। সাজ-সরঞ্জাম একে একে আবার তুলে ফেলতে সুরু করেন।

(৯)

চা আর চিনি একটা ব্যাগের ভেতর পূরে রেখে আবার বলতে আরম্ভ করেন। এখন কথা হলো, এই ভাবে স্ত্রীলোককে উঁচুতে তুলে দিয়ে যে-সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে আজ সমগ্র জগৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।”

—স্ত্রীলোককে উঁচুতে তুলে দিয়ে, মানে? যা-কিছু অধিকার বা সুযোগ সে তো সব পুরুষদেরই দখলে! জিজ্ঞাসা করে উঠি।

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক জবাব দিয়ে ওঠেন, হাঁ, হাঁ, সেই কথাই আমি আপনাকে বলছি, শুনুন। একটা বিচিত্র ব্যাপার গড়ে উঠছে, একদিকে স্ত্রীলোকদের যতদূর সম্ভব নীচুতে আটকে রেখেছি, তেমনি আর একদিকে তারা সকলের ওপর মাথা তুলে রয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে, স্ত্রীলোকদের অবস্থা ঠিক ইহুদীদের মতন। ইহুদীরা যেমন সামাজিক প্রতিপত্তি এবং অন্য নানান দিক থেকে ক্ষমতা পেয়ে নিজেদের সামাজিক নির্য্যাতনের খানিকটা পুষিয়ে নেয়, স্ত্রীলোকরাও ঠিক তাই করে।

ইহুদীরা যেন বলতে চায়, ও! আমাদের বেণে বলে তোমরা তুচ্ছ করো! বেশ, বেণে হয়েই তোমাদের ওপর আমরা আধিপত্য করবো! তেমনি স্ত্রীলোকেরাও ভাবে, ও! তোমাদের হুকুমে আমাদের শুধু তোমাদের খেয়াল-খুশীর যন্ত্র হয়ে থাকতে হবে! বেশ, সেইভাবেই তোমাদের ওপর আমরা আধিপত্য করবো!

স্ত্রীলোকদের যে ভোট দেবার কিংবা আদালতে কাজ করবার অধিকার নেই অথবা এটা-সেটাতে যোগদান করবার ক্ষমতা নেই, তাতে তার আসল অধিকারের অস্বীকৃতির কথা ওঠে না; আসল ব্যাপার হলো, যৌন-সম্পর্কের ওপর যে সব সামাজিক কাজ বা দায়িত্ব নির্ভর করে, সেখানে সে পুরুষের অধীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্বামি-নির্বাচনে তাকে পুরুষের জন্যেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

"আপনি বলবেন যে এই সব অধিকার স্ত্রীলোকের ওপর দেওয়া একটা বীভৎস ব্যাপার হবে! বেশ, তাহলে পুরুষদের সে সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক্। আজকাল সেগুলো পুরুষদেরই একচেটে অধিকার বটে কিন্তু এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিয়ে খেলা করে এবং এই ইন্দ্রিয়-ভোগের ভেতর দিয়ে এমনভাবে তাদের দাবিয়ে রাখে যে, নির্বাচনের অধিকারটা শুধু একটা মৌখিক প্রথায় পরিণত হয়। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাই জিনিসটা যা দাঁড়ায়, তাতে স্ত্রীলোকই হলো আসল নির্বাচক এবং যখন একবার

এই বিজয়-রীতি তার আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন তা নিয়ে সে যথেচ্ছাচার করে এবং পুরুষের ওপর একটা ভয়ঙ্কর অধিকার সে তখন বিস্তার করে।”

জিজ্ঞাসা করি, এই যে স্ত্রীলোকদের বিজয়-রীতির কথা বল্লেন, এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রকাশ আপনি কিসে দেখলেন?

ভদ্রলোক জবাব দেন, সব জিনিসে, সর্বত্র। উদাহরণস্বরূপ, শহরের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যান, দেখতে পাবেন। জানলায় যে-সব জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়, তার পেছনে কত যে টাকা খরচ হয়েছে, তা হিসেব করেও বলা কঠিন এবং সেগুলো তৈরী করতে পুরুষদের কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে! দোকানের ভেতরে ঢুকে, সেই সব জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করে দেখুন, দেখবেন, তার দশভাগের এক ভাগও পুরুষদের জন্যে নয়। জীবনের বিলাস-উপকরণের যে বিরাট ব্যবসা জগৎ জুড়ে চলেছে, তার অস্তিত্ব এবং তার প্রসার একমাত্র নির্ভর করছে স্ত্রীলোকদের প্রয়োজনীয়তার ওপর। কারখানা-গুলোর কথা ভেবে দেখুন। তাদের অধিকাংশ শুধু তৈরী করছে, অপদার্থ সব অঙ্গ-আভরণ, না হয় সাজ-সজ্জা, আসবাব-পত্র, না হয় খেলনা···স্ত্রীলোকদের জন্যে। নারীর মুহূর্ত্তের খেয়ালের খোরাক জোগাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক, বংশ-পরম্পরায় ক্রীতদাস হয়ে, কারখানার কারাগারে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে চলেছে। সম্রাজ্ঞীর মত নারী, মানবতার

দশভাগের ন-ভাগকে কারাগার আর উদায়াস্ত পরিশ্রমে অভিশপ্ত করে রেখে দিয়েছে।

"নারীর অধিকার হরণ করা এবং তাদের অধঃপাতে নিয়ে যাবার জন্যে, এইভাবে নারী পুরুষদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে চলেচে। তাদের সমস্ত কলা-কৌশলের একমাত্র লক্ষ্য হলো, আমাদের মধ্যে যে দুর্নীতি-প্রবণতা লুকিয়ে থাকে, তাকে জাগিয়ে তোলা এবং সেইভাবে জাগিয়ে তুলে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো যে ফাঁদ বিস্তার করে তারা রাখে তাতে আমাদের ফেলা। হ্যাঁ, আমি যে অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার কথা বলেছি, তার মূলে রয়েছে এই ব্যাপারই। স্ত্রীলোক আজ নিজেকে পুরুষের সম্ভোগবস্তুরূপে এমন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী করে তুলেছে যে, কোন পুরুষই শান্ত সহজভাবে তার সম্মুখীন হতে পারে না। যখনই কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হয়, তখনই তার যাদু—শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে ফেলে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি যেন নিমেষে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে যায়। এমন কি, আমার আগের বয়সে, যখনই নাচের-পোষাকে সুসজ্জিত কোন নারীর সামনে গিয়ে পড়তাম, কেমন যেন চঞ্চল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম। এখন অবশ্য সেই-জাতীয় দৃশ্য দেখলে আমি ভেতর থেকে শিউরে উঠি কারণ তার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অকল্যাণ, একটা স্পষ্ট বিপদের আশঙ্কা···আইনত যেরকম বিপদের সম্ভাবনা সমাজে থাকা উচিত নয়। মনে হয়, তক্ষুণি

পুলিশ ডেকে আনি, চোখের সামনে যে মহ-আতঙ্ক নড়ছে ফিরছে তা থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্যে তাকে অনুরোধ করি, হয় তাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও কিংবা চিরকালের মত দূর করে দাও।"

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে হেসে উঠে বলেন, "শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে, না? কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে হাসবার কিছুই নেই। হয়ত এমন এক সময় আসবে এবং আমার মনে হয় তা খুব শিগ্‌গিরই আসবে, যখন মানুষ এই ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে শিখবে এবং অবাক্ হয়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা করবে, কি করে সমাজে মানুষ জেনে-শুনে এই রকম বিপদ্‌কে প্রশ্রয় দিত? এক মুহূর্তের জন্যেও এই আত্ম-প্রতারণায় নিজের মনকে ভোলাতে কি পারেন যে, এই যে দেহকে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে সমাজ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিঃশব্দে ষড়্‌যন্ত্র করে চলেছে, এটা কি শুধু প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের কামনাকে জাগাবার জন্যে নয়? এবং তার মধ্যে কি সমাজের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই? যেন, স্ত্রীলোকের অধিকার আছে, প্রকাশ্যভাবে, পথে-ঘাটে, সদর রাস্তায়, অলি-গলিতে চারদিকে ফাঁদ পেতে রাখবার এবং বিশ্বাস করুন, যা হচ্ছে, তার চেয়েও তা ভয়ঙ্কর! আমি জিজ্ঞাসা করি, ভাগ্যের ওপর যে সব খেলার হার-জিত নির্ভর করে, জুয়ো বলে আইনতঃ তাদের বন্ধ করা হয়েছে, স্ত্রীলোকেরা যখন স্বেচ্ছায় প্রলুব্ধকারী পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়, তখন আইন কেন তাকে নিষিদ্ধ

করে না? জুয়োর হার-জিতের খেলার চেয়ে, তা সহস্রগুণ মারাত্মক।

[দশ]

"ঠিক এই একইভাবে আমি নিজে ফাঁদে ধরা পড়ি। লোকে যাকে বলে প্রেমে পড়া, আমারও ভাগ্যে তাই ঘটলো। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে যে শুধু মনে হতো আমার স্বপ্নের আদর্শ নারী বলে, তা নয়, যতবার আমি তার কাছে প্রেমনিবেদন করতে গিয়েছি, ততবার আমি নিজেকেও মনে করেছি, পুরুষ-রতন বলে। আসল কথা কি জানেন? জগতে এমন কোন বদমায়েস লোক নেই, তা সে যতদূর বদমায়েসই হোক্ না কেন, যে তার চেয়েও নিকৃষ্টতর আর একটীকে খুঁজে বার করতে না পারে এবং তাতে করে আত্মশ্লাঘার সে একটা কারণ খুঁজে পায়।

ঠিক তাই ঘটে আমার বেলায়। আমি টাকার জন্যে বিয়ে করি নি। আমার পরিচিত বন্ধু—বান্ধবদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি, স্ত্রীর অর্থের লোভে, অথবা স্ত্রীর প্রতিপত্তিশালী বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের লোভে, তারা বিয়ে করেছে কিন্তু আমার নির্বাচনের মধ্যে লাভের বা লোভের কোন অংশ ছিল না। আমি ছিলাম ধনী, আমার স্ত্রী ছিলেন দরিদ্র। সেই হলো আমার আত্মশ্লাঘার প্রথম কারণ। আর একটী ব্যাপার, যার দরুণ আমি সমান আত্মশ্লাঘা বোধ করতাম, সেটা হলো,

আমি দেখেছি অনেকেই বিয়ের পরও সমানভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন চালিয়ে যাবে, এই ধারণা নিয়েই জেনেশুনে বিয়ে করে। আমি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি যে বিয়ের পর কোনমতেই স্ত্রীর বিশ্বাস নষ্ট করবার মতন কোন কাজই করবো না এবং তার দরুণ নিজের সম্বন্ধে যে কি উচ্চ ধারণাই পোষণ করতাম, তা বলে বোঝান যায় না। হাঁ, সেইজন্যেই নিজেকে দেবশিশু বলে সগর্ব্বে জাহির করতাম।

আমাদের এন্‌গেজমেন্ট-কাল* খুব অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং আজও সেকথা স্মরণ করতে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। কি জঘন্য কেটেছে সে-সময়টা! আমরা ভেবেছিলাম যে, আত্মিক ভালবাসার সংযোগেই আমরা দুজনে একত্র হয়েছি। কিন্তু আমাদের ভালবাসা বা মিলনের মধ্যে যদি কোথাও এতটুকু আত্মার সংস্পর্শ থাকতো, তাহলে আমাদের কথাবার্ত্তায় তা ফুটে উঠতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। যখন দুজনে নিভৃতে থাকবার সুযোগ পেতাম, তখন কি কথা বলবো, তা যেন এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। মনে মনে ভেবে ঠিক করতে হতো কি বলবো, বলতামও,

---

* খৃষ্টান য়ুরোপীয় রীতি অনুসারে আসল বিয়ের আগে, পাত্র আর পাত্রী অঙ্গুরী-বিনিময়ের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়। সেই সময় থেকে বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত হলো, এন্‌গেজমেন্ট কাল।

তারপর আবার চুপচাপ হয়ে যেতাম, তারপর আর মাথা খুঁড়লেও আর কিছু খুঁজে পেতাম না। বল্‌বার মতন নতুন আর কিছুই ছিল না। সামনে যে নব-জীবন আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সে-সম্পর্কে যা-কিছু বলবার বা ভাববার, ভবিষ্যৎ জীবনের যা-কিছু পরিকল্পনা, সবই বলা হয়ে গিয়েছে। নতুন আর কি বলা যায়? যদি আমরা মানুষ না হয়ে জন্তু হতাম, তাহলে অন্তত এটুকু জানতাম যে কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। কিন্তু যেহেতু আমরা জন্তু নই, সেহেতু কথা বলতে আমরা বাধ্য, যদিও বলবার মতন কোন কথাই আর খুঁজে পেতাম না। এর সঙ্গে যোগদান করুন, রাশি-রাশি মিষ্টি খাওয়া, ডিনার দেওয়া, জঘন্য সব প্রথা। বিয়ের আয়োজন সম্পর্কে যত সব বিরক্তিকর ব্যাপার, যেমন ধরুন, বিয়ের পর থাকবার জায়গার ব্যবস্থা, আমার স্ত্রী সকাল বেলা কি পোষাক পরবেন, তার তালিকা প্রস্তুত করা, আমি নিজে সেদিন কি পোষাক পরবো, কি অঙ্গরাগ ব্যবহার করবো, ইত্যাদি…।"

"অবশ্য, কিছুক্ষণ আগে যে বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটী নেমে গেলেন, তিনি যে-রকম বিবাহের কথা বলছিলেন, আমাদের পুরাণো রাশিয়ান গির্জ্জার যাঁরা ফাদার, তাঁদের উপদেশ এবং বিধান অনুযায়ী, সে-ধরণের বিবাহে, বিছানা-মাদুর, যৌতুক, খাট-পালঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপার ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহের অনুষ্ঠানেরই সাধারণ অঙ্গবিশেষ। কিন্তু আমাদের দেশে

যাঁরা বিয়ে করেন, তাঁদের দশজনের মধ্যে ন'জন গির্জ্জার ধর্ম্মানুষ্ঠানকে মেনে চলেন, কেন না, তার ফলে বিয়েটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, এই মাত্র। আমি জোর করে বলতে পারি, অধিকাংশ বিবাহিত লোকই বিবাহের সময় গির্জ্জার অনুষ্ঠানকে অল্পবিস্তর একটা সর্ত্ত বলে মনে করেন, যে-সর্ত্ত পালন করার মধ্যে তাঁরা একটী মেয়েকে অধিকার এবং ভোগ করবার ক্ষমতা পান।

(১১)

"এইভাবেই প্রত্যেকের বিবাহ হয় এবং আমারও হয়ে গেল। তারপর সুরু হলো, সেই বহু-নন্দিত মধু-চন্দ্রিমার কাল। নামটার মধ্যেই একটা "বেথস্" * স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

"একদিন প্যারিস শহরে ঘুরে এটা-ওটা-সেটা দেখতে দেখতে, হঠাৎ একটা সাইন-বোর্ড নজরে পড়লো, একটী দাড়ি-ওয়ালা স্ত্রীলোক আর একটা সিন্ধু-ঘোটকের মূর্ত্তি তৈরী করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে, ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি, দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক

---

* য়ুরোপীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'বেথস্' হলো একটা রসচ্যুতি। যখন একটা ভাব স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বোচ্চ বিকাশের চূড়ায় ওঠে, সেইখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত। কিন্তু তারপরও যদি কেউ সেই উচ্চস্তর থেকে আবার সেই ভাবের জের টানতে আরম্ভ করে, অথবা তার সঙ্গে গরমিল কোন্ ভাব জুড়ে দেয়, তাহলে তাকে বলে "বেথস্"।

বলে বাইরে যে বিজ্ঞাপন টাঙানো হয়েছে, আসলে সেটা হলো মেয়েদের পোষাকে দাড়ি-ওয়ালা একজন পুরুষমানুষ এবং একটা কুকুরের গায়ে সিন্ধু-ঘোটকের চামড়া জড়িয়ে একটা স্নানের টবে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্তটাই একটা বিরাট্ ধাপ্পা। যখন বেরিয়ে আসছি, তখন সার্কাসের মালিক মহাসম্মানে আমাকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত স্বয়ং এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং বাইরের অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, এই ভদ্রলোকটীকেই জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন···ইনি এইমাত্র নিজে দেখে বেরুচ্ছেন···কি অপূর্ব্ব জানোয়ার! চলে আসুন! চলে আসুন! মাত্র এক ফ্রাঙ্ক মাথা-পিছু! আমি প্রতিবাদ করে বলতে পারলাম না যে, যা দেখে এলাম, তা কিছুই নয়,—বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো এবং সার্কাসের মালিক আমাকে দেখেই বুঝেছিল, প্রতিবাদ করতে আমার সঙ্কোচই হবে। মধু-চন্দ্রিমার সমগ্র বিসদৃশতার মধ্যে দিয়ে যাকেই যেতে হয়েছে, ঠিক এই রকমই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে···ঠিক এমনি-ভাবেই তারা অপরকে সাবধান করে দেওয়া থেকে সঙ্কোচে বিরত হয়েছে। আমিও সে-সম্বন্ধে তখন কারুরই স্বপ্ন ভাঙ্গতে চেষ্টা করিনি কিন্তু আজ সেই সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবার আর কোন কারণই দেখি না; আজ মনে হয়, এই ব্যাপার সম্বন্ধে যা সত্য, তা অবিলম্বে জগৎকে জানানো একান্ত প্রয়োজনীয়।

"সে-সত্য হলো, মধু-চন্দ্রিমার মধ্যে কোন মধুই নেই, একান্ত ক্লান্তিকর, জঘন্য এবং সর্বোপরি বিরক্তিকর, অসম্ভব রকম বিরক্তিকর। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যখন প্রথম আমি সিগারেট খেতে শিখছিলাম, সেই সময়, সিগারেটের ধোঁয়া টানার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গা-বমি করে এলো, মনে হলো যেন জ্বর আসছে, মুখ দিয়ে অনবরত লালা কাটতে লাগলো, তাড়াতাড়ি সমস্ত লালা গিলে খেয়ে ফেল্লাম এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখাতে চাইলাম যে, ব্যাপারটা হাঁ, বেশ আরামপ্রদই বটে।"

—মধু-যামিনী সম্পর্কে বড় বিচিত্র কথা আপনি বলছেন,—অনুযোগ করে উঠি, আপনি যদি বলেন তুটী প্রাণীর একত্র বাস করার ফলে বমি-বমি ভাব জাগে, তাহলে আমরা মনুষ্য-জাতির বৃদ্ধি কি করে আশা করতে পারি ?

—তা বটে, কিন্তু নিরুপায়! কেন, মনুষ্যজাতি যদি নিশ্চিহ্নই হয়ে যায় ?

আপনার মনে তিক্তকণ্ঠে ভদ্রলোক শেষের কথা কয়টী পুনরুক্তি করেন···আমি যে প্রতিবাদ করবো, তা যেন তিনি আগে থাকতেই জানতেন !

"আপনি যদি প্রচার করেন, সন্তান-প্রসব-নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে করে ইংরেজ লর্ড-শরীরে চর্বি জমা করবার মাল-মশলা বিনা-বাধায় পেয়ে যান, কেউ আপনাকে তিরস্কার করবে না। কিন্তু নীতির দোহাই দিয়ে যদি সন্তান-প্রসব-

নিয়ন্ত্রণ করবার কথা একবার মাত্র তুলেছেন, দোহাই ভগবান! চারদিক থেকে কি চীৎকারই না জেগে উঠবে!"

হঠাৎ থেমে গিয়ে, আলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, মাপ করবেন, ঐ আলোটা চোখে বড় লাগছে···যদি ঢাকনাটা নামিয়ে দিই, আশা করি আপত্তি করবেন না?

তাতে আমার কিছু যায় আসে না, জানাতেই, ভদ্রলোকটী তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে, সব কাজেই তাঁর এই তাড়াহুড়ো ভাব, আসনের ওপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে আলোর ওপর পশমি ঢাকনাটা টেনে দিলেন।

যে-কথা উঠছিল আমি তার প্রতিবাদ করিলে, ব্যবহারিক জগতে যদি প্রত্যেক মানুষ জীবন-ধারা-পরিচালনের নীতি হিসাবে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলে অচিরকালের মধ্যেই পৃথিবীতে মনুষ্য-জাতি দুর্লভ হয়ে উঠবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমার সামনের আসনে দু পা ফাঁক করে ছড়িয়ে দিয়ে, হাঁটুর ওপর হাতের কনুই রেখে, ভদ্রলোক স্থির হয়ে বসলেন। বল্লেন, আপনার প্রশ্ন হলো, মনুষ্য-জাতি তা হলে কি করে বেঁচে থাকবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য-জাতির বেঁচে থাকবার দরকারই বা কি?

বিস্মিত হয়ে বলে উঠি, দরকার? তা না হলে আমাদের অস্তিত্বই তো থাকে না!

"কিন্তু কেন আমাদের অস্তিত্ব থাকবে ?"

"কেন থাকবে ? বেঁচে থাকবো বলেই থাকবে !"

"বেশ, তাহলেই কথা আসে, আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ? যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যেই যদি জীবন ধারণ করা হয়, তা হলে বেঁচে থাকার কোন সঙ্গত কারণই থাকে না। এবং তাই যদি হয়, তাহলে শোপনহায়ার এবং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা অভ্রান্ত সত্য কথাই বলেছেন। অপর পক্ষে, যদি মানব-অস্তিত্বের মূলে কোন লক্ষ্য থাকে, কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্যে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে, বা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও শেষ হয়ে যায়। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা……

আপনার মনে শেষ কথাটা ভদ্রলোক আবার উচ্চারণ করেন, ··উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরে যে উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে, তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তটাকে রীতিমত গুরুত্ব দান করেন।

"হাঁ, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথাই। এখন আমার কথাগুলো বেশ করে বিচার করে দেখুন। এই মানব-অস্তিত্বের উদ্দেশ্য যদি, সুখ-শান্তি, প্রীতি বা ভালবাসা হয়, বা যে কোন নাম দিয়েই তাকে অভিহিত করুন না কেন, পুরাকালে যে সব সাধু-সজ্জন বা ভগবানের প্রেরিত পুরুষেরা এসেছিলেন, তাঁরা যে বারবার ঘোষণা করে গেলেন, প্রেমে সব মানুষকে এক হতে হবে, হাতের তলোয়ারকে ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফলা তৈরী করতে

হ'বে, কেন তা বাস্তবে পরিণত হলো না আজও পর্য্যন্ত? কিসে তা পেলো বাধা? তার একমাত্র উত্তর হলো, মানুষের কামনার পাহাড়ে আঘাত লেগে বারবার এই সব আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এই সব কামনার মধ্যে, সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক, সব চেয়ে যে নিজেকে সব সময় জাহির করে আছে, সে হলো আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনা। সুতরাং আমরা যদি এই সব কামনার, বিশেষ করে এই ইন্দ্রিয়জ কামনার মূলোৎপাটন করতে পারি, তাহলেই জগতের কল্যাণ সম্পর্কে সেই সব ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়ে উঠবে। প্রেমের সূত্রে মানুষ আবার এক-পরিবার-ভুক্ত হবে, মানব-অস্তিত্বের চরম লক্ষ্যে সেদিন মানুষ পৌঁছে যাবে এবং যখন আর এই পৃথিবীতে মানুষের এই ধারাবাহিক অস্তিত্বের কোন প্রয়োজনই হবে না।

যতদিন এই মনুষ্য-জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ততদিন তার অস্তিত্বের প্রেরণার জন্যে তার সামনে একটা আদর্শ থাকবেই। এবং সে-আদর্শ কখনো কুকুর-শেয়ালের আদর্শ হতে পারে না, কোন রকমে সন্তান-উৎপাদন করে যাওয়া. কোন রকমে সংখ্যা বাড়ানো। সে-আদর্শ হলো মহৎ কল্যানের আদর্শ, যে কল্যান শুধু সম্ভব সংযমের দ্বারা, তিতিক্ষার দ্বারা, সুপবিত্র সম্বন্ধ-বোধের দ্বারা। এই আদর্শের দিকেই আমরা বরাবর অগ্রসর হয়ে এসেছি এবং আজও অগ্রসর হয়ে চলেছি।

কিন্তু মনে করুন, ভগবান যদি এই আদর্শ-সিদ্ধির জন্তে

মানুষকে যেমন মরণশীল করে গড়ে তুলেছেন, তেমনি মরণশীলই করতেন অথচ তাদের মধ্যে কোন কামনা-বাসনা না থাকতো ? কিম্বা যদি তাদের অমর করেই গড়ে তুলতেন ? প্রথম ব্যবস্থাই যদি সত্যি হতো, তাহলে মানুষ তার জীবনের আদর্শকে উপলব্ধি না করেই মরে যেতো এবং বাধ্য হয়ে ভগবানকে তখন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোন নূতনতর সৃজন-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হতো। অপরপক্ষে মানুষ যদি অমর হয়েই জন্মাতো, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে শত সহস্র বর্ষ পরে, একদিন হয়ত তারা সেই আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারতো, তখন আর তাদের অস্তিত্বের কোন সার্থকতাই থাকতো না। তখন তাদের নিয়ে কি করা যেতে পারতো ? তারচেয়ে এখন যে-ব্যবস্থা আছে, সেইটেই অপেক্ষাকৃত ভাল।

হয়ত আমি যে-ভাবে এই সব কথা বল্লাম, তা আপনি অনুমোদন করেন না। হয়ত আপনি একজন বিবর্ত্তনবাদী। কিন্তু তাই যদি হ'ন তবু ও আমার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আপনি দ্বিমত হতে পারবেন না। প্রাণী-জগতের এই অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় মানুষ সকলকে ছাড়িয়ে সবার ওপরে উঠেছে। এই জীবন-প্রতিযোগিতায় নিজেদের অটুট রাখবার জন্যেই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, মৌচাকে কেন্দ্রীভূত মৌমাছিদের মতন, অযথা শুধু বংশ বৃদ্ধি করে ছড়িয়ে পড়লেই চলবে না ! এবং এই মৌমাছিদের মতনই, আমাদের মধ্যে থেকে সেই মানুষের দলকে গড়ে তুলতে হবে, যারা

যোনিকে বাদ দিয়েই জীবন ধারণ করতে শিখবে; যাদের লক্ষ্য হবে আত্ম-সংযম, এবং আজ যেভাবে আমাদের সমাজ ইচ্ছা করে কামনাকে জাগাবার জন্তে যে সব আয়োজনের সৃষ্টি করছে, সে সব আয়োজনকে তারা বর্জ্জন করতে শিখবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করলেন,

"জিজ্ঞাসা করছেন, মানুষ একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি না? নিশ্চয়ই যাবে। জীবনকে যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, যে ভাবেই তাকে গ্রহণ করুন না কেন, তার এই চরম পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি আছে? মৃত্যুর মতনই তা স্থির, অবধারিত। পৃথিবীর যত ধর্মমত আছে, সব এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, অচিরে হোক কিম্বা কল্প কল্পান্ত দূরে হোক্, এই পৃথিবী একদিন প্রলয়ে শেষ হয়ে যাবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেরও সেই মত। যদি মানুষের নীতি-ধর্ম্ম সেই কথাই-প্রচার করে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

কামনা, তা তাকে যেমন করেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখুন না কেন, তা হলো পাপ, ভয়াবহ অকল্যাণ, যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে; আজ যেমন আমরা তাকে নিয়ে সস্নেহে লালন-পালন করছি, কামনা তার যোগ্য বস্তু নয়। বাইবেলে যে বলেছে, যে-ব্যক্তি কোন নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, আসল সহবাসের আগেই সেই দৃষ্টি দিয়ে সে কাম-সম্ভোগের অপরাধে অপরাধী হয়, একথা যে শুধু

অপরের স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা নয়, নিজের স্ত্রী সম্বন্ধেও তা ষোল-আনা প্রযোজ্য। বর্ত্তমান জগতে যে-ভাবে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, তাতে এই মতবাদের উল্টো ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হয়ে চলেছে। এই যে আমাদের বিয়ের পর মিথুন-যাত্রা, গুরুজনেরা দাঁড়িয়ে থেকে তরুণ দম্পতীকে সমাজ থেকে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একলা থাকবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়, এটা-শুধু অবাধ ভোগ-লালসা চরিতার্থ করবার আইন-সম্মত একটা ব্যবস্থা ছাড়া আর কি ?

[১২]

"কিন্তু, যে-অনাচার আমরা করি, তার প্রত্যেকটির জন্যে স্বতন্ত্র শাস্তি মাপা আছে। মধুচন্দ্রিমার জীবনকে সফল করে তোলবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটীই করি নি কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু একটা লজ্জার গ্লানি, তিক্ত বিরক্তি, এই শুধু লাভ হলো। কয়েকদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, এ শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণার অবরুদ্ধ-জীবন।

খুব অল্পসময়ের মধ্যেই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। একদিন, বোধ হয় সেটা বিয়ের তিনদিন কি চারদিন পরেই হবে, দেখি, আমার স্ত্রী যেন বিরক্ত হয়ে বসে আছেন ; তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমি তাঁকে আদর করে আলিঙ্গন করলাম। আমার ধারণা, যেন এ ছাড়া তাঁর আর

কোন কাম্য আমার কাছ থেকে নেই। কিন্তু তিনি আমার হাত সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? কি যে ব্যাপার, তা তিনি প্রকাশ করে বলতে পারলেন না কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে তিনি বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত বোধ করছেন। আমাদের দুজনের আসল সম্পর্কটা যে কি, তার স্বরূপ হয়ত তখন তার স্নায়ুর কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবে যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হচ্ছিল, সেটা কিন্তু জ্ঞানত কথায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম। উত্তরে শুধু একবার অস্পষ্ট-ভাবে যা বল্লেন, তা থেকে বোঝা গেল যে মার জন্যে মন কেমন করছে। আমি সে কথাটা সত্য বলে মনে করতে পারলাম না, তাই মার কথা একেবারে উত্থাপন না করেই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। মনের দিক দিয়ে তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, মার কথাটা মাত্র তারই ইঙ্গিত, একথাটা তখন বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু মার কথা উত্থাপন করলাম না দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি চটে গেলেন, যেন আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম না, এই অভিযোগ। বলে উঠলেন, আমি এখন দেখছি, তুমি আমাকে ভালবাসো না। উত্তরে আমি তাঁকে মৃদু ভৎর্সনা করলাম, বড় খামখেয়ালী তুমি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। মুখের বিষণ্ণতা স্পষ্ট বিরক্তিতে পরিণত হয়ে গেল এবং ক্রুদ্ধ ভাষায় তিনি

অভিযোগ করতে শুরু করে দিলেন যে, আমি নাকি স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম। দেখলাম, সমস্ত মুখের রেখা স্পষ্ট প্রাণহীন হিম হয়ে উঠেছে, মৈত্রীর চিহ্ন মাত্র সেখানে নেই···এমন কি সে-মুখ দেখে বলা যায় যে, তিনি আমাকে স্পষ্ট ঘৃণাই করছেন।

আজও মনে পড়ে, সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কি এক আতঙ্কে মন ছেয়ে গেল। কেন এই পরিবর্ত্তন? কি করে সম্ভব হলোই বা তা? প্রেম! আত্মায় আত্মায় মিলন! কোথায় গেল সে-সব? তার বদলে এ সব কি হলো? মনের মধ্যে আপনা থেকে জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো, এ-ও কি হতে পারে? এই কয়েকদিন আগেও যে-নারীকে চিনতাম, এতো সে-নারী নয়!

তবুও তাঁকে শান্ত করবার জন্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম যে সে দুর্ভেদ্য হিম-প্রস্তরের বিষাক্ত বাধা টলাবার ক্ষমতা আমার নেই; এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্দ্দমনীয় ক্ষিপ্ততা পেয়ে বসলো আমাকে এবং তার ফলে দুজনেই দুজনকে জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলাম।

সেই প্রথম ঝগড়ার যে ছাপ মনে রয়ে গেল, তা অবর্ণনীয়, ভয়াবহ। অবশ্য এটাকে আমি ঝগড়া বলেই উল্লেখ করছি কিন্তু আসলে সেটা তা ছাড়া অন্য আর কিছু। সেটা হলো স্রেফ্ আমাদের দুজনের মাঝখানে যে বিরাট গহ্বর লুকিয়ে ছিল, তার হঠাৎ আবিষ্কার। প্রেম বলতে যা ছিল, তা

নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, এখন তুজনার যা আসল সম্পর্ক তাই তুজনার সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, তুটি আত্মকেন্দ্রিক প্রাণী, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অজানা।

তাই আমাদের তুজনের মধ্যে যে ঝগড়াটা হলো, সেটা আসলে ঝগড়া নয়, সেই প্রথম পরস্পর দেখতে পেলাম, পরস্পরের সম্পর্ক কি! অবশ্য তখনও সেটা সম্পূর্ণ দেখতে পাই নি, দেখেছিলাম মাত্র তার আভাস এবং তখনও সম্পূর্ণভাবে বুঝি নি যে, সেই বিরূপতা, সেই হিম প্রাণহীনতা, সেইটেই আমাদের আসল সম্পর্ক। বিয়ের প্রথম অবস্থায় এই জাতীয় ঝগড়ার দরুণ যে মানসিক তিক্ততা জাগে, তা আবার অচিরকালের মধ্যে প্রেমের বাষ্পে সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে যায় এবং তখন মনে হয়, সত্যিই সামান্য একটা মনোমালিন্য ঘটে গেল, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ভুল-বোঝাবুঝি আর হবে না। আমিও ঠিক সেইভাবেই নিজেকে বুঝিয়েছিলাম।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই, আর এক নতুন পর্বের আয়োজনের মুখে, আবার যেন মনে হলো, পরস্পর পরস্পরের কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠেছি এবং তার ফলে আর একবার ঝগড়া হলো। এই দ্বিতীয় মনোমালিন্যের রেখা প্রথম অভিজ্ঞতার চেয়ে আরো গভীরভাবে মনে পড়লো। মনে মনে ভাবলাম, তাহলে সেই প্রথম ঝগড়াটা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়। কোন একটি বিশেষ কারণ থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছিল এবং যখনি সেই কারণটি প্রকট হয়ে উঠবে, তখনই এই

ঝগড়াও আবার দেখা দেবে। দ্বিতীয় ঝগড়ায় এত গভীরভাবে আন্দোলিত হবার আর একটা কারণ ছিল যে, অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সেটির সূচনা হয়। সামান্য টাকার ব্যাপার নিয়ে, যে-টাকার ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না, বিশেষ করে আমার স্ত্রী-সম্পর্কে তো নয়ই। মনে আছে, তিনি ব্যাপারটাকে এমন বড় করে দেখলেন যে, যেহেতু আমার টাকা আছে, সেহেতু, তাঁর ধারণা যে, আমি সেই টাকার আধিক্যের দরুণ তাঁর ওপর আধিপত্য জাহির করতে চাইছি। এ অভিযোগ যে কতদূর ভিত্তিহীন, কুৎসিত, নীচ এবং অস্বাভাবিক, তা আমি জানতাম।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, অসভ্য বলে তাঁকে ভৎর্সনা করলাম। তিনিও প্রত্যুত্তরে সেই কথাই ফিরিয়ে দিলেন এবং মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সেই প্রাণহীন ক্রূর বিরূপতার রেখা, যা প্রথম ঝগড়ার দিনে দেখেছিলাম, এবারেও তাঁর মুখে স্পষ্ট হয়ে তা ফুটে উঠেছে।

মনে পড়ে, আমার বাবার সঙ্গে, আমার ভায়ের সঙ্গে, মাঝেমাঝে আমি ঝগড়া করতাম; কিন্তু যে বিষাক্ত ঘৃণা আমার স্ত্রী আর আমার মাঝখানে এই ঝগড়ার ফলে দেখা দিল, সেখানে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু, এবারেও, কিছুদিন পরেই আমাদের এই পারস্পরিক ঘৃণার সম্বন্ধের কথা তথাকথিত প্রেমের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেল এবং আমি আবার আমার মনকে এই বলে বোঝালাম

যে, এই দুটি ঝগড়াই ভুলবশতঃ ঘটে গিয়েছে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি যা অনায়াসেই ঠিক করে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় এবং তারপরে চতুর্থ কলহের আগমনে আমার সে ভ্রান্তি আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম যে, এই কলহ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, ভুল বোঝাবুঝি নয়, একান্ত অনিবার্য্য কার্য্যকারণের যোগফল এবং যা হয়েছে, তা না হয়েই পারে না এবং এই রকমই বারেবারে হবে···

সেই সম্ভাবনার অনিবার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যেন জমে হিম হয়ে গেল। এতদিন নিজের মনে মনে বিবাহিত জীবন যেভাবে কাটাবো বলে কল্পনা করে রেখেছিলাম, আজ প্রকৃতক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন যাপন করবার আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে এলো এবং সে-ভার আর এক কারণে আরো গুরুতর বোধ হতে লাগলো। সে কারণটি হলো, আমার তখন ধারণা ছিল যে আমি শুধু একাই এইভাবে স্ত্রীর সঙ্গে নিত্য কলহে বিপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি, অন্য বিবাহিত লোকেরা আমার চেয়ে ঢের বেশী সৌভাগ্যশালী। তখন আমি জানতাম না যে, এই হলো বিবাহিত জীবনের সর্বসাধারণ সংস্করণ এবং প্রত্যেকেই মনে করে যে তারই ভাগ্য বিশেষভাবে শুধু তাকেই প্রবঞ্চিত করেছে, যেমন আমি নিজে ভাবতাম। তখন আমি জানতাম না যে, প্রত্যেক বিবাহিত লোকই তাদের ভেতরকার এই অবস্থা

বাইরের অন্য লোকের কাছ থেকে, এমন কি নিজেদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

আমার ক্ষেত্রে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এর সূচনা হয় এবং প্রতিদিন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরো সঙ্গীন এবং ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অন্তরের অন্তরতম স্থলে আমি বুঝতে পারি যে আমি ফাঁদে পড়ে গিয়েছি, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে আমার মনে যে কল্পনা ছিল, তার সঙ্গে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন মিলই নেই ; আনন্দের উৎসের পরিবর্ত্তে আমার বিবাহ আমার কাছে এক দুঃসহভার বলে বোধ হতে লাগলো। কিন্তু অন্য আর পাঁচজনের মতই, সেকথা আমি তখন স্বীকার করতে চাইলাম না, বাইরের লোকের কাছে তো নয়ই, এমন কি আমার নিজের কাছেও নয়।

এখন যখনি সেকথা ভাবি, রহস্যের মতই সেই কথা বারে বারে মনে হয় ; কি করে সেই সব বাস্তব ঘটনার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা যে কত গুরুতর দাঁড়িয়েছে, তা একটা ব্যাপার থেকেই নিঃসন্দেহাতীতভাবে বোঝা যেতো, সে ব্যাপারটা হলো, এইসব ঝগড়ার উপলক্ষ্য সব সময়ই ছিল অতি তুচ্ছ। এত হাস্যকর-ভাবে তুচ্ছ যে, ঝগড়ার পর প্রায়ই মনে করতে পারতাম না, কেন ঝগড়া হয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে যে আন্তরিক মানসিক বিরূপতা অবিচ্ছেদভাবেই বেড়ে চলেছিল,

তাকে পুরোমাত্রায় প্রকাশ করতে হলে যে-সব সুবৃহৎ অনুসঙ্গের সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল, আমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি সে-অনুযায়ী তীব্র ছিল না। তার চেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, যে সব অছিলা আশ্রয় করে আমাদের দুজনার আবার মিল ঘটতো। দুটো মিষ্টি কথা, যা-হোক একটা কিছু কারণ দেখানো, এমন কি দু'এক ফোঁটা চোখের জল। কিন্তু তার মধ্যে আবার এমন ব্যাপারও ঘটতো, মনে করতে আজও ঘৃণায় আমার মন ভরে যায়, তুমুল ঝগড়ার মধ্যে দুজনে দুজনকে অকথ্য-ভাষায় গালাগাল দিলাম···কিন্তু পরক্ষণেই দুজনে আবার নীরব হয়ে যেতাম···এবং সেই নীরবতাকে ভরিয়ে তুলতো হাসি, চুম্বন এবং আলিঙ্গন।"

[১৩]

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুজন নতুন যাত্রী উঠলো। গাড়ীর এক কোণে গিয়ে তারা বসবার জোগাড় করলো। যতক্ষণ না তারা আসনে সুস্থির হয়ে বসলো, ততক্ষণ পদনিশেফ্ চুপ করে রইলো।

আসন ঠিক করে নিয়ে বসার দরুণ তাদের চলা-ফেরা থেকে যে শব্দ উঠছিল, তা থেমে গেল। থামার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার বলতে সুরু করলো, যেখানে শেষ করেছিল ঠিক তার পর থেকেই···সামান্য একটা কথাও যেন সে বাদ দিতেচায় না।

সে বলতে সুরু করলো, এই ব্যাপার সম্পর্কে আসল কোন্ জায়গায়টায় মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, জানেন? মুখের কথায় প্রেমকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়, তাতে তার চেয়ে বড় আদর্শ বা তার চেয়ে উন্নততর কোন অনুরাগ আর হতে পারে না কিন্তু কার্য্যতঃ প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রেমের যে চেহারা ফুটে ওঠে, তার কথা মনে পড়লে বা মাত্র উল্লেখ করতে গেলে মন ঘৃণায় ভরে যায়। প্রকৃতি যে তার মধ্যে এই জঘন্য বিসদৃশতা সৃষ্টি করেছে, তার মূলে পর্য্যাপ্ত হেতু আছে। কিন্তু আমার কথা হলো, যদি সত্যিই তা জঘন্য হয়, তবে তা লুকোবার দরকার কি? গলা উঁচু করে স্পষ্টভাষায় তা স্বীকার করা উচিত। তা না করে, মানুষ উল্টে প্রচার করে বেড়ায় যে তার চেয়ে উন্নত, তার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছু নেই।

বিস্মিত হয়ে নিজের মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরস্পরের প্রতি মারাত্মক বিতৃষ্ণা, কোথায় কি থেকে এর উৎপত্তি হলো? অথচ তার কারণ যে কি, তা দিবালোকের মত স্বচ্ছ বোধ হলো। এই যে বিতৃষ্ণা, আমি জানি, এ শুধু অন্তরের প্রতিবাদেরই রূপান্তর। একজনের স্বভাবকে চেপে মেরে ফেলে আধিপত্য করতে চায় আর একজনের স্বভাব। এবং দুজনের মধ্যে কেউ তা সহ্য করবে না। তাই এই পারস্পরিক বিতৃষ্ণা। যখন এই বিতৃষ্ণার মুখোমুখী দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, তখন তার তীব্রতায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অথচ

আমরা ঘৃণা ছাড়া পরস্পরকে আর কিছু দিতেও পারতাম না। দুজন খুনে যেমন এক পাপে, এক অন্যায়ে জড়িত থাকার দরুণ, মনে মনে পরস্পরকে ঘৃণা করে, এ ঠিক সেই জাতীয় ব্যাপারই।

হয়ত আপনি ভাবছেন যে আমি অবাস্তব কথা তুলছি। মোটেই না। আমার স্ত্রীকে আমি কি করে খুন করলাম, তারই কাহিনী পর্য্যায়ক্রমে আপনাকে জানাচ্ছি। আদালতে আমার বিচারের সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি অস্ত্র দিয়ে কি-ভাবে আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেছিলাম। তারা মূর্খ, তারা ভেবেছিল যে ৫ই অক্টোবর তারিখে, একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ অস্ত্র দিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম। কিন্তু আসলে সেদিন আমি তাকে খুন করি নি। তার বহু বহু আগে, আজ এই মুহূর্ত্তে ঠিক যেমনভাবে অন্য বহু স্বামী তাদের স্ত্রীদের খুন করছে, আমিও সেইভাবে আমার স্ত্রীকে খুন করি। হাঁ, অবাক্ হচ্ছেন কি? বহু স্বামী, বহু কেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই খুন করছে তাদের স্ত্রীদের।

জিজ্ঞাসা করে উঠি, কেমন ভাবে?

"এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার আর কিছু কল্পনা করা যায় না, যে জিনিষ সব মানুষই জানে স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং প্রত্যক্ষ বলে অথচ কেউ তা চোখে দেখতে পায় না; যে-সব জিনিষ প্রত্যেক ডাক্তারের জানা উচিত এবং যা লোকদের জানিয়ে দেওয়া তাদের কর্ত্তব্য, সেই একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তারাই সব চেয়ে নীরব হয়ে থাকে।

আসলে ব্যাপারটা জটিল নয়। খুব সহজ। পৃথিবীতে পুরুষদের যত সংখ্যা, নারীদের সংখ্যাও প্রায় তার সমান। এ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই আপনা থেকে সত্য হয়ে উঠছে। নিম্নতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির বশে সেই সত্যকেই পালন করে চলে এবং সেই সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যে মানুষের কোন অসাধারণ প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। সে সত্য হলো, আত্মসংযম একটা অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নিয়ম। অতিসহজ বলেই বোধহয় আজও পর্য্যন্ত মানুষ তা আবিষ্কার করতে পারে নি। আমাদের রক্তকণিকার মধ্যে দৃষ্টির অগোচর যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণী আছে, তা বিজ্ঞান খুঁজে বার করেছে, খুঁজে বার করেছে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যত সব অপ্রয়োজনীয় অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু এই সহজ সত্যটুকুকে উপলব্ধি করবার মতন মনোবৃত্তি সে আজও খুঁজে বার করতে পারে নি। আপনি নিশ্চয়ই শোনেন নি যে বৈজ্ঞানিকেরা এইজাতীয় কোন তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন?

সুতরাং এই সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার পক্ষে স্ত্রীলোকদের দিক্ থেকে দুইটি মাত্র উপায় আছে। প্রথমটি হলো, যখনি প্রয়োজন হবে তখুনি জননী হবার যে স্বাভাবিক শক্তি তার আছে, তাকে চিরকালের মত নষ্ট করে ফেলা, দ্বিতীয়টি অবশ্য সত্য কথা বলতে কি, এই বিপদের সম্ভাবনা থেকে একেবারে মুক্ত হবার ঠিক পথ নয়। সেটা হলো, আর কিছু নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। স্ত্রী-

লোককে তার সন্তানকে লালন-পালন করতে হয়, আবার সেই সঙ্গে তার স্বামীর রক্ষিতার কাজ করতে হয়। আমাদের সমাজে যে সব মূর্চ্ছা আর নার্ভ-ভেঙে-যাওয়ার কথা শুনি আর চাষীদের মধ্যে যে সব ব্যাপার ঘটে মালিকানি সত্ত্বের নামে, সকলের মূলে এই ব্যাপার। রাশিয়ার সমাজের এই হলো চেহারা। মনে করবেন না যে য়ুরোপের অন্য অঞ্চলে তা আলাদা। যে-সব স্ত্রীলোক এই মালিকানি স্বত্বের ক্রীতদাসী এবং যারা প্রফেসর চারকোর ডিস্‌পেনসারীতে মহিলা-রোগী হিসাবে চিকিৎসার জন্যে যান, তারা দুজনেই সমান পঙ্গু। আজ পৃথিবী ভর্ত্তি এই জাতীয় পঙ্গু-স্ত্রীলোকে।

একটু স্থির হয়ে যদি বিচার করে দেখা যায় যে, একজন স্ত্রীলোক যখনগর্ভবতী হয় কিংবা যখন বুকে করে কোন শিশুকে সে লালনপালন করে, যে শিশুর মধ্যে দিয়ে জগতের জীব-চক্র এগিয়ে চলেছে, তাহলে দেখা যাবে যে সেই সামান্য ব্যাপারটির মধ্যে কি বিরাট, কি সুমহান একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ঘটে চলেছে। এখন কথা হলো, এই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সুপবিত্র কর্ত্তব্যে বাধা পড়ছে এবং কিসের জন্যে এই বাধা? কি এই বাধা ? তবুও আমরা স্বাধী-নতার বুলি কপ্‌চাই...নারীর অধিকার সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা দিই। তা যদি হয়, তাহলে নরমাংসভোজী অসভ্যরাও বলতে পারে, যাদের আমরা ধরে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে অবশেষে খেয়ে ফেলি, তাদের স্বাধীনতা, তাদের

অধিকার সম্বন্ধে মনে করো না যে আমরা মোটেই ভাবি না !"

এ জাতীয় উক্তি এর আগে জীবনে আমি শুনি নি। স্বভাবতই তাই মনে গভীর রেখাপাত করলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি কি বলতে চান ? যদি আপনার কথা ঠিক হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পৃথিবী থেকে উঠে যায় এবং পুরুষ মানুষ, আপনি তো জানেন···

আমার কথা শেষ না হতেই সে বলে ওঠে, জানি। আপনি যা বলতে চাইছেন, আমি জানি সেটা হলো, বিজ্ঞানের মহা-পুরোহিত আপনাদের ডাক্তার-প্রভুদের অতি প্রিয় যুক্তি। নারী যে-জন্যে পুরুষের কাছে অপরিহার্য্য বলে এই ডাক্তারেরা ঘোষণা করে থাকেন, যদি কোন রকমে নারীদের মধ্যে থেকে সেই অপরিহার্য্যতাটাকে বাদ দিয়ে দেখানো সম্ভব হতো তাহলে এই ডাক্তারদের দেখিয়ে দিতাম, তাঁরা তখন কি বলেন। অপরিহার্য্যতা। একটা মানুষকে দিনের পর দিন নানারকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে, শরীরের পক্ষে মদ হলো অপরিহার্য্য, বুঝিয়ে দাও যে তামাক ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, আফিম-খাওয়াটা একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ, দেখবে আপনা থেকেই জগতে এই সব জিনিস অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। মানুষের কি দরকার তা কি সৃষ্টির সময় ভগবান্ জানতেন না ? না, সে-সময় ডাক্তারদের পরামর্শ নেন নি বলে, সৃষ্টি-কার্য্যে তিনি সমস্ত গোলমাল করে ফেলেছেন ?

আসল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, ছুটো পরস্পর-বিরোধী অবস্থার কি করে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? ডাক্তারের ওপর নির্ভর করে থাকুন, তাঁরা সমস্ত কেটে ছেঁটে সমান করে দেবেন এবং তাঁরা তাই করলেন ও…তাঁরা এই সমস্যার একটা সমাধান বার করলেন। হায়, যদি কেউ এই পাপিষ্ঠগুলোকে তাদের জোচ্চুরির জন্যে আদালতে তুলতে পারতো! এখন পর্য্যন্ত তা সম্ভব হয় নি বটে কিন্তু এই তার উপযুক্ত সময়। আর বিলম্ব হলে মহা-অনর্থ ঘটবে। দেখছেন তো, ইতিমধ্যে আমরা কোথায় এসে পড়েছি? লোকে পাগল হয়ে যাচ্ছে …নিজের হাতে নিজের মাথার খুলিকে উড়িয়ে দিচ্ছে এবং সব এই বিশেষ সমাধানের জন্যেই। এই ব্যবস্থার এই পরিণাম।

বনের পশুরা তাদের প্রবৃত্তির বশেই জানে যে তাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্য দিয়ে তাদের বংশ-ধারা বেঁচে চলেছে এবং চলবে এবং সেইজন্যে তারা এই সম্পর্কে কতকগুলো আইন-কানুন আপনা থেকেই মেনে চলে। একমাত্র মানুষই তা মেনে চলে না। মেনে চলতে জানে না। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষকে তারা ধ্বংস করে পঙ্গু করে ফেলেছে…সত্য এবং আনন্দের পথে যে-নারী হবে তার প্রত্যক্ষ সহায় ও সহচরী, তাকে সে পরিবর্ত্তিত করে গড়ে তুলছে আনন্দ আর অগ্রগতির মহাশত্রুরূপে। আপনার চারিদিকে চোখ চেয়ে দেখুন এবং

বলুন, কে বা কিসে মানুষের অগ্রগতিকে বিপন্ন করে তুলেছে? নারী। এবং তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন তারা এই ভাবে মানবতার মহাশত্রুর কাজ করছে? উত্তর একটু আগেই দিয়েছি।

উত্তেজিত হয়ে আসন থেকে সে ওঠে পড়ে। ঘাড় নেড়ে বারবার নিজের মনে যেন বলতে থাকে, হাঁ, হাঁ···

ভেতরের উত্তেজনাকে প্রশমিত করবার জন্যে পকেট থেকে একটা সিগরেট বার করে ধরায়···

[১৪]

"অন্য আর পাঁচজনের মতই সংসার করে চলেছিলাম··· তবে আমার দুর্দৈব, আমি নিজেকে একটু স্বতন্ত্র মনে করতাম। যেহেতু আমি পরস্ত্রী গমন করতাম না, সেহেতু আমার পরম গর্ব্ব ছিল যে আমি নিষ্কলুষভাবেই সাংসারিক জীবন যাপন করছি, নৈতিক দিক থেকে আমি আদর্শস্থানীয়, অনিন্দনীয় আমার জীবন। তবে দাম্পত্যকলহের ফলে মাঝে মাঝে যে শান্তি ব্যাহত হতো, তার জন্যে মনে মনে স্ত্রীকেই দায়ী করতাম। তার চরিত্রের জন্যেই এই অশান্তি। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, দোষটা ষোল আনাই তার নয়। অন্য আর পাঁচজন স্ত্রীলোকের মতন, মানে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মতনই সে ছিল। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা যে ভূমিকা অভিনয়

করে, সেই অনুরূপ শিক্ষাই সে পেয়েছিল এবং সেইজাতীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই মানুষ হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের ধনী সমাজের মেয়েরা যে ধরণের শিক্ষা পেয়ে থাকে, তার শিক্ষা তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না।

স্ত্রী-শিক্ষার নতুন নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বুলি কপচানো আজকাল ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সব পরিকল্পনাই হচ্ছে বাজে, সম্পূর্ণ নিরর্থক জিনিস। বর্ত্তমান সমাজে একমাত্র নারীর যৌনগত সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের যেভাবে দেখে, সেইভাবেই স্ত্রীশিক্ষা রূপ নেয় এবং আজকের সমাজে পুরুষেরা নারীকে কি চোখে দেখে, সে-সম্বন্ধে কেউই অজ্ঞ নয়। সুরা, সুন্দরী আর সুর···ছন্দে কবিতায় কবিরা এই কথাই প্রচার করেন। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের কবিতা পড়ুন, চিত্র-বিদ্যা আর স্থপতি-শিল্পের প্রত্যেকটি সৃষ্টি অনুসন্ধান করে দেখুন, দেখবেন প্রেমের কবিতা আর ভিনাস আর ফ্রিনীর মূর্ত্তি···সমাজের সর্ব্বোচ্চস্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র দেখবেন, নারী শুধু পুরুষের সুখের যন্ত্র।

এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, শয়তানদের ধাপ্পাবাজী। নারীকে এইভাবে অপমানিত করেই তারা সন্তুষ্ট নয়, সমস্ত ব্যাপারটা অতি সযত্নে এবং কৌশলে এক ছদ্ম-আবরণে ঢেকে রেখেছে। সেইজন্যেই আমরা দেখি প্রাচীনকালে বীর-পুঙ্গব নাইটরা সারা দেশময় ঘুরে বেড়িয়ে নারীর মহিমাকে রক্ষা

করছেন, কারণ নারীকে তাঁরা দেবী বলে পূজা করতেন। আমাদের যুগেও পুরুষরা নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে কম যান না, গাড়ীতে কোন মহিলা উঠলে তাই তাড়াতাড়ি তাঁরা উঠে স্থান ছেড়ে দেন, তাঁর হাত থেকে রুমাল পড়ে গেলে না-বলতেই কুড়িয়ে দেন, কেউ কেউ আবার তার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে নাগরিক জীবনের দায়িত্বপূর্ণ পদে, দেশের শাসন-ব্যাপারে নারীর অধিকারকে স্বীকার করতে গররাজি হন না। কিন্তু এই সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং অধিকার-দেওয়া-নেওয়ার লম্বা লম্বা কথা সত্ত্বেও জাগতিক ক্ষেত্রে নারীর সার্থকতা ও স্থান অপরিবর্ত্তনীয়ই রয়ে গিয়েছে। সেদিনও সে যা ছিল আজও সে তাই আছে, পুরুষের সম্ভোগের বস্তু। এবং সে-কথা নারী নিজে খুব ভালভাবেই জানে।

ঠিক এই অবস্থা ও ব্যবস্থা, কাজে ও কথার মধ্যে ঠিক এই রকম পার্থক্য আমরা দেখতে পাই ক্রীতদাস প্রথায়। বহু মানুষের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় লোক, এই হলো ক্রীতদাস-প্রথা। মানুষকে শৃঙ্খলিত করে তার কাছ থেকে সস্তায় কাজ আদায় করে নেবার মোহ যত দিন না মানুষ মন থেকে বিসর্জ্জন দিতে পারবে, যতদিন না মানুষ এই প্রবৃত্তিকে ঘৃণ্য জঘন্য বলে বুঝতে পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চলবে ক্রীতদাস-প্রথা। তবে হ্যাঁ, ক্রীতদাস-প্রথা আজ উঠে গিয়েছে, তার অর্থ হলো সভ্যমানুষ ক্রীতদাস-প্রথার বাইরের খোলসটাকে বর্জ্জন করেছে, যার ফলে আজ

প্রকাশ্য বাজারে ক্রীতদাস কেনা-বেচা আইনতঃ দণ্ডনীয়। তাতে করেই মানুষ নিজেকে বুঝিয়েছে যে ক্রীতদাস-প্রথা পৃথিবী থেকে আজ উঠে গিয়েছে কিন্তু তারা ভুলেও একবার ভেবে দেখে না, সেদিনও যেমন ছিল, আজও সেই জঘন্য প্রথা ঠিক তেমনিই আছে…যতদিন মানুষ পরের পরিশ্রমের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করাকে ধর্ম্মসঙ্গত এবং ন্যায্য মনে করবে ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রথা তেমনিই থাকবে এবং তাকে প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগাবার লোকের অভাবও হবে না।

নারীর দাসত্বপ্রথা-সম্বন্ধে ঠিক এই একই অবস্থা। পুরুষের ভোগ্যা-সামগ্রী-রূপে তার অস্তিত্বকে পুরুষ ন্যায্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এই স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করেই ঘটা করে তাকে ভোটের অধিকার দেওয়া হচ্ছে, সমাজের দায়িত্ব-পূর্ণ পদে তাকে অধিষ্ঠিত করবার আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু পুরুষ সমানভাবেই তাকে ভোগ্যা-বস্তু-হিসাবে দখল করে আছে এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করেই তার সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। শৈশব থেকে তার নারীত্ব বিকশিত হওয়া পর্য্যন্ত সযত্নে তার মনে সেই ধারণাই অনুপ্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। এই ভাবে তার রূপান্তর ঘটে চলছে। নারী হয়ে উঠছে নীতিহীন জঘন্য ক্রীতদাসী, পুরুষ হয়ে উঠছে নীতিহীন জঘন্য ক্রীতদাস-চালক। বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, সর্ব্বত্র তাকে দিচ্ছি ভোটের অধিকার কিন্তু ভেতরে তার স্থান আগে যা ছিল তাই-ই থাকছে। আজ তাই প্রয়োজন তাকে বোঝান, সে

যেখানে নিজেকে নিয়ে এসেছে, সে তার আসল স্থান নয়, দেখবে আবার সে নিজেকে উন্নততর জীব হিসাবে দেখতে শিখবে কিন্তু স্কুল আর কলেজের শিক্ষায় তার সে পরিবর্ত্তন আনতে পারবে না। এই পরিবর্ত্তন তখনই সম্ভব হবে, যখন পুরুষরা নারী সম্বন্ধে তাদের ধারণার পরিবর্ত্তন করতে পারবে, যখন নারীরাও নিজেদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে শিখবে এবং এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, একটা পরিবর্ত্তিত সামাজিক আবহাওয়া, যেখানে নারী বুঝতে পারবে তার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে তার নিষ্কলুষ কৌমার্য্যে, যেটাকে আজ সে মনে করে হেলায় নষ্ট করবার জিনিস। যতদিন না এই মতের পরিবর্ত্তন ঘটছে, ততদিন যে-ধরণের শিক্ষাই তাকে দেওয়া হক না কেন, সে আজ যা আছে, তাই-ই থাকবে। তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে বহু পুরুষকে বিমুগ্ধ ক'রে তার মধ্যে থেকে তার সুবিধামত একজনকে বেছে নেওয়া যায় এবং সে-ক্ষেত্রে একজন মেয়ে—যে অপর মেয়ের চেয়ে অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, বা তার চেয়ে ভাল এস্রাজ বাজাতে পারে, তাতে একবিন্দু ইতর-বিশেষ কিছু হয় না। আজকার নারী তখনই সুখী হয়, তার যা কিছু কাম্য সবই মনে করে সে পেয়ে গিয়েছে, যখন সে দেখে যে পুরুষকে বিমুগ্ধ করবার মতন তার শক্তি আছে। এই হয়ে আসছে এত কলে ধারে, এবং তাই-ই হয়ে চলবে। আমাদের সমাজের অবিবাহিত নারীদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং বিবাহের পর এই ধারণা নিয়েই সে স্বামীর পাশে

গিয়ে দাঁড়ায়। যখন সে কুমারী থাকে, তখন এই ধারণাই তার মনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে কারণ যত বেশী পুরুষকে তার জালের মধ্যে ধরতে পারবে, ততই তার বেছে নেওয়ার সুবিধা হবে। বিবাহিত-অবস্থাতেও এই ধারণা তার সমান বলবৎ থাকে, কারণ সে ভাবে তাহলেই সে তার স্বামীর ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে। একমাত্র একটি ঘটনায়, এই ধারণা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়, সাময়িক ভাবে তার মনের তলায় চলে যায়, সে ঘটনা হলো সন্তান-সম্ভাবনা। এবং তাতেও কোন-কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না, কারণ জননী যারা হয় তাদের মধ্যে রাক্ষসীও বহু থাকে, যারা নিজের সন্তান নিজে লালন-পালন করতে অস্বীকার করে এবং এ-সব ক্ষেত্রে সহায়করূপে আবার আবির্ভূত হন সেই ডাক্তার।

আমার স্ত্রী প্রথম সন্তান প্রসবের পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এলেন মহামহিম ডাক্তার মহাশয়, তিনি নির্লিপ্ত বৈরাগ্যে রোগীকে স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখলেন (তার জন্যে অবশ্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হলো এবং সঙ্গে-সঙ্গে পারিশ্রমিকস্বরূপ দক্ষিণাও দিতে হলো) এবং আদেশ করলেন যে, রোগিনী যেন সন্তানকে স্তন্যদান না করেন। এই আদেশের ফলে একমাত্র যে উপায় ছিল, যা দিয়ে তিনি কোকেট্রির * হাতে থেকে

---

*এই ফরাসী কথাটি ইংরেজীভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হয় বাংলাভাষাতেও কথাটিকে সশরীরে গ্রহণ করাই ভাল। কারণ কোকেট বলতে যে-ধরণের নারীকে বোঝায় বাংলাভাষায় এক কথায় তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সত্যিই মুক্ত হতে পারতেন, তা বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আমাকে একটি ধাইকে ভাড়া করে নিযুক্ত করতে হলো, নিজের ছেলেকে স্তন্য দেবার জন্যে। অর্থাৎ আর একটি নারীর দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে তার সন্তানের কাছ থেকে টাকা দেখিয়ে সাময়িকভাবে টেনে নিয়ে আসা হলো এবং তার পরিবর্তে তাকে মাথায় নতুন টুপি দিয়ে আর নতুন লেসের পোষাক পরিয়ে ভুলিয়ে রাখা হলো। একথা অবশ্য প্রসঙ্গতই উল্লেখ করলাম। আসল কথা হলো, এইভাবে জননীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার ফলে আমার স্ত্রীর মনের মধ্যে সুপ্ত কোকেট-পনা পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠলো এবং তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে আমার মধ্যে ঈর্ষ্যার জ্বালা শতগুণ বেড়ে উঠলো। তার জন্যে বিবাহিত-জীবনে এক মুহূর্তেরও শান্তি পাইনি এবং ক্রমশ তার যন্ত্রণা একরকম অসহ্য হয়ে উঠলো। এই যে ঈর্ষার জ্বালা, এটা যে শুধু আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা নয়; আমি যেভাবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছিলাম, সেইভাবে যে-সব স্বামীকে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

[১৫]

"আমার বিবাহিত-জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ঈর্ষার এই উন্মত্ত জ্বালা থেকে মুক্ত হতে পারি নি। তার মধ্যে এমন একটা সময় গিয়েছে যখন মনে হয়েছে, এই যন্ত্রণায় যেন প্রাণান্ত হয়ে যাবে। আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর ডাক্তারের পরামর্শে স্ত্রী যখন সন্তান-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন, সেই সময়টা ঠিক ঐ রকম প্রাণান্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়।

সেই সময়ে আমার ঈর্ষ্যা যে এতখানি তীব্র হয়ে ওঠে, তার দুটা কারণ ছিল। প্রথম হলো, এইভাবে সন্তান-পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহৃতি লাভ করার দরুণ, আমার স্ত্রীর মধ্যে একটা অস্বস্তি দেখা দিল; যে-সব স্ত্রীলোক এইভাবে স্বাভাবিক জীবনকে এড়িয়ে চলে, তাদেরই মধ্যে এই জাতীয় একরকমের বিচিত্র অস্বস্তি জেগে ওঠে। দ্বিতীয় হলো, স্ত্রীকে যখন দেখলাম অনায়াসে এইরকম ভাবে জননীত্বের দায়িত্বকে সরিয়ে রাখতে, তখন স্বভাবতই আমার মনে অজ্ঞাতসারেই, একটা ধারণা জেগে উঠলো, তাহলে হয়ত স্ত্রীর দায়িত্বও সে এমনি অনায়াসে সরিয়ে রাখতে পারে। বিশেষ করে, তাঁর স্বাস্থ্য তখন সম্পূর্ণ অটুটই ছিল এবং পরে দেখেছি, ডাক্তারের আদেশ অগ্রাহ্য করে যখন তিনি তাঁর পরবর্ত্তী সন্তানদের স্তন্যদান করেছেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি হয় নি।"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, আপনি দেখছি ডাক্তারদের বড় বেশী ভালবাসেন।

কারণ যখনি দেখেছি ভদ্রলোক ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনি তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন তিক্ত হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক উত্তর দিয়ে উঠলেন, ভাল লাগা বা না লাগার কথা নয়। আমার স্ত্রীর জীবন এই ডাক্তারেরাই সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে এবং আজও এই মুহূর্ত্তে তারা শত-সহস্র এই রকম স্ত্রীর জীবন ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। সুতরাং কার্য্যও কারণের এই সংযোগ অবজ্ঞা করতে পারি না। অবশ্য এ-কথা একান্ত স্বাভাবিক যে, উকীল বা অন্যবৃত্তিধারীদের মতন, ডাক্তারেরাও তাদের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যে চেষ্টা করবে। তা তারা করুন কিন্তু তাঁরা যদি অপরলোকের সাংসারিক জীবনের মধ্যে মাথা না গলান তাহলে আমি আমার বাৎসরিক আয়ের অর্দ্ধেক খুশী হয়ে তাঁদের দিয়ে দিতে রাজী আছি এবং আমি বলতে পারি আমার দেখাদেখি আরো অনেকেও তা দিতে পারেন। তাঁরা তাঁদের নিয়ে থাকুন, অপরকেও শান্তিতে থাকতে দিন। আমি বহু ঘটনা জানি যেখানে তাঁরা অপারেশন করবার অছিলায়, হয় অজাত-ভ্রূণস্থ শিশুকে মেরে ফেলেছেন, না হয় তার জননীকে মেরে ফেলেছেন। অথচ কোনদিন কেউ এই সব হত্যাকাণ্ডের জন্যে কোন জবাব-দিহি চায় না, যেমন ধারা ইন্‌কুইজিশনের নামে যে-সব হত্যা-কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, হত্যাকাণ্ড বলে কেউ তাদের গণনা করে

না। কারণ, সেগুলো নাকি হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্যে। চিকিৎসক-বৃত্তিধারীরা জগতে যে কত অনাচার করে চলেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে-সব অনাচারও অতি তুচ্ছ বোধ হয়, যদি তার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নৈতিক অধোগতি, বস্তুতান্ত্রিকতার যে কালো ছাপ তারা নারীর মধ্যে দিয়ে জগতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদি তাঁদের উপদেশমতো কাজ করতে হয়...তাঁরা সর্ব্বদাই উপদেশ দিচ্ছেন তোমার চারদিকে যেখানে পা ফেলবে, সেখানে অসংখ্য মারাত্মক জীবাণু সব তোমাকে আক্রমণ করবার জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে...তাহলে প্রতিবেশীর নিকটে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়...মানুষের কাছ থেকে মানুষকে অনবরত দূরে সরে যেতে হয়। যদি নিষ্ঠাসহকারে ডাক্তারের কথা মেনে চলতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে দূরে দূরে আলাদা উঠতে বসতে হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে হাতে কারবলিক এসিডের সিরিঞ্জ না থাকলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। ইদানীং আবার শুনছি নাকি, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন কারবলিক এসিডও নাকি অচল। এ-কথা অবশ্য কথাপ্রসঙ্গে উঠলো বলেই বলছি। কিন্তু আসল যে বিষ তাঁরা ছড়াচ্ছেন, তা হলো মানুষের নৈতিক অধোগতি বিশেষ করে স্ত্রীলোকের। আজ যদি কেউ কাউকে বলে, বন্ধু, তুমি এলোমেলো ভুল জীবন যাপন করছো...সুন্দরতর জীবন কামনা কর। সেটা নিতান্ত সেকেলে অপ্রয়োজনীয় বাতুলতার

মন্তন শোনাবে। নিজেকে হোক অথবা অপরকে হোক, এই জাতীয় উক্তি আজ আর কেউ করে না। যদি তুমি অস্থায় জীবন যাপন কর, তার কারণ ডাক্তারেরা খুঁজে বার করে তোমাকে বলে দেবে, তোমার স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্যে কোথায় কি যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে সুতরাং তোমাকে ভাল হতে হলে, বিশেষতঃ ডাক্তারের কাছে স্নায়ুর চিকিৎসার জন্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তিনি তোমাকে ওষুধ লিখে দেবেন, এক শিলিং দিয়ে কিনে যথা-নির্দ্দেশ গ্রহণ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন দেখবে, তাতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে আসছে, তখন আরো ডাক্তার, আরো বড় ডাক্তার, আরো বেশী ওষুধ খেতে হবে। অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!

"কিন্তু কথা উঠলো বলেই, এই প্রসঙ্গ তুলতে হলো। আমার বক্তব্য হলো, আমার অন্য যে-সব ছেলেমেয়ে পরে হলো তাদের নিজে স্তন্যদান করার ফলে আমার স্ত্রীর শরীর ও মনের কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, রীতিমত ভালই হলো এবং আমার দিক থেকে যে ঈর্ষ্যার জ্বালায় আমাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হচ্ছিল, এই সময়, তার হাত থেকেও অনেকটা রেহাই পেলাম। যদি আমার স্ত্রী তা না করতেন, তাহলে হয়ত, যে বিপদ শেষ-কালে একদিন ঘটলো, বহু আগেই তাহা সজ্ঘটিত হয়ে যেতো। নবজাত শিশুরা তাঁকেও সেদিন বাঁচিয়েছিল, আমাকেও বাঁচালো। আটবছরের মধ্যে পাঁচটি সন্তান তিনি প্রসব করেন এবং প্রত্যেকটিকেই নিজে স্তন্যদান করেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, এখন তারা সব কোথায়? তারা মানে আপনার ছেলেপুলেরা?

হঠাৎ আমার দিকে আতঙ্কিত-দৃষ্টি তুলে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ছেলেরা? আমার ছেলেরা?

"ক্ষমা করবেন, হয়ত আমার এই প্রশ্নতে আপনার মনে কোন নিদারুণ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুললাম।"

"না···তা নয়। তাদের মামী আর তাদের মামারা তাদের ভার নিয়েছিল। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তাদের দিয়েছি কিন্তু তার বদলে আমার নিজের ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তারা আমার উপর দিতে চায়নি। দেখছেন তো, আমি উন্মাদ, বাতিকগ্রস্ত লোক। আমি আজ তাদের কাছ থেকে দূরে, আরো দূরে সরে যাচ্ছি। আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা কিছুতেই তাদের আমার কাছে ছেড়ে দেবে না। যদি তারা আমার তত্ত্বাবধানে থাকতো, তাহলে তাদের আমি এমনভাবে গড়ে তুলতাম যাতে তারা তাদের বাপ-মায়ের ছাঁচ এতটুকু না পায়। ঠিক সেই জিনিসটাই তারা চায় না। তারা চায় আমরা যেমনটি ছিলাম, তাদেরও ঠিক সেইরকমটি করে গড়ে তুলতে। নিরুপায়! তারা স্বভাবতঃই আমাকে অবিশ্বাস করবে, চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে আমার ছেলেদের সরিয়ে রাখতে। তা ছাড়া, এটাও অবশ্য ভেবে দেখবার বিষয় তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার মতন শক্তি আমার আছে কিনা। আমার ধারণা, আমার

তা নেই। আজ আমি পঙ্গু…একটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তবে আমি জানি…হাঁ…আমি জানি এবং তার মধ্যে কোন সন্দেহই নেই যে, লোকে যা বুঝতে দেরী করবে, আমি আজ তা অনায়াসেই বুঝতে পারবো। হাঁ, আমি জানি, আমার ছেলেমেয়েরা তাদের আশে-পাশে যে-সব বর্ব্বর অসভ্য ঘুরছে ফিরছে, তাদেরই মতন হয়ে উঠবে। আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম…তিনবার…দেখা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি। এখন আমি চলেছি, সকলকে ছেড়ে দূরে দক্ষিণ-অঞ্চলে, সেখানে আমার নিজস্ব একটা ছোট বাড়ী আর বাগান আছে। আজ আমি যা জেনেছি, আমি যা শিখেছি, হাঁ আমি জানি, তা শিখতে, তা জানতে এখনো ওদের অনেক সময় লেগে যাবে। সূর্য্যে কতটা পরিমাণে লোহা আছে কিংবা অন্য-সব গ্রহ-উপগ্রহে কোন্ ধাতুটা কতটা পরিমাণে আছে, তা জানা খুব বেশী কঠিন নয় আজ; কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন আজ, নিজেদের ব্যবহারের মধ্যে কোথায় আছে দুর্নীতির বীজ, তাকে খুঁজে বার করা। এই যে আপনি অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য শুনছেন, জানবেন তার জন্যে আমি কম কৃতজ্ঞ নই আপনার কাছে।”

"এই মাত্র আপনি ছেলেদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন... ভেবে দেখুন, তাদের সম্বন্ধেই কি সব ভ্রান্ত ধারণা চারদিকে প্রচার করা হয়! শিশুরা হলো ভগবানের আশীর্ব্বাদ, শিশুরা হলো জীবনের আনন্দ। এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। একদা হয়ত তা চরম সত্য ছিল, কিন্তু আজ বহুদিন হলো, তা থেকে বিন্দু-বিন্দু করে সমস্ত সত্য নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। আজ শিশুরা হলো শুধু যন্ত্রণার কারণ, তা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ গর্ভ-ধারিণীই সে-কথা মনে-মনে উপলব্ধি করেন এবং অসতর্ক মুহূর্ত্তে কেউ-কেউ তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেও ফেলেন। আমাদের সমাজে সচরাচর যে-কোন ছেলেমেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করুন, যাঁরা প্রাচুর্য্যের মধ্যেই জীবন-যাপন করেন, তাঁর কাছ থেকে আপনি শুনতে পাবেন, পাছে ছেলেমেয়েরা অসুখে-বিসুখে মরে যায়, সেই ভয়ে তাঁরা ছেলেপুলে যাতে না হয়, তাই-চান; যদি জন্মায়, তা হলে তাদের স্তন্যদান করতে তাঁরা বিমুখ হন, এই ভয়ে যদি তার ফলে তাঁদের অতিরিক্ত মায়া পড়ে যায়, তার জন্যে হয়ত তাঁদের বহু অশান্তি ভোগ করতে হবে। কল্পনায় তাঁরা শিশুর আবির্ভাব চিন্তা করে সুখ পান, তার সেই ছোট্ট দুটী হাতের আবেদন, তার সেই ছোট দুটী পায়ের টল্‌টল্ চলা...কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী

যন্ত্রণা তাঁরা বোধ করেন, ছেলে-মেয়ের অসুখে বা মৃত্যুতে নয়, তাদের অসুখ হতে পারে বা তারা অকালে মরে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায়। তাই দুদিকের পাল্লা ওজন করে বিচার করে দেখে তাঁরা স্থির করেন যে, ছেলেপুলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল এবং তাঁদের এই সিদ্ধান্ত তাঁরা প্রকাশ্যভাবে বুক ফুলিয়ে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন এবং জগৎকে বোঝাতে চান যে শিশু-প্রীতি বশতই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এবং এই অনুভূতির জন্যে তাঁরা রীতিমত একটা গর্ব্ব অনুভব করেন; এই সিদ্ধান্তের জন্যে যেন তাঁদের উচ্চপ্রশংসাই পাওনা, এই রকম একটা ভাব দেখান। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, তাঁদের এই যুক্তির আড়ালে যা রয়েছে, সে হচ্ছে স্রেফ্ আত্ম-প্রীতি; শিশু-প্রেমের গন্ধ তার মধ্যে নেই। শিশুর দরুণ যে অশান্তি তাঁরা পেতে পারেন, তারই আশঙ্কায় তাঁদের প্রেম সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং সেই আশঙ্কার বশেই তাঁরা যা পেতে চান তাকেই অস্বীকার করেন। যাকে ভালবাসি, তার জন্যে তাঁরা নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে পারেন না; যে অনাগত প্রিয় আসছে, নিজের সুখের জন্যে উল্টে তাকেই অস্বীকার করেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এটা ভালবাসা নয়, এটা হলো স্বার্থপরতা।

"অপরপক্ষে, সম্ভ্রান্ত-পরিবারের এই-সব জননীদের স্বার্থ-পরতার জন্যে তাদের নিন্দা করতেও মন চায় না, যখন দেখি, ডাক্তারদের কৃপায় এই-সব ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্যে

সত্যিই যে উদ্বেগ আর অশান্তি তাঁদের ভোগ করতে হয়। আজ এই মুহূর্ত্তে, যখনই মনে পড়ে আমার বিবাহিত-জীবনের প্রথম কয়েক বছর আমার স্ত্রী ছেলেপুলেদের নিয়ে যে কি অবিচ্ছেদ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনই শিউরে উঠি। তাদের নিয়েই সর্ব্বক্ষণ তাঁর সব চিন্তা, সব ভাবনা জড়িয়ে থাকতো। সত্যি বলতে কি, তাকে মানুষের জীবন বলা যায় না, কুকুর-বেড়ালের জীবন। অষ্টপ্রহর এক অনাদি বিপদ ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, মাঝে মধ্যে হয়ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে উঠতে না উঠতেই আবার ঠিক তেমনিভাবে ঘাড়ের ওপর চেপে বসে, মনে হয় এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। এই ভাবে মনে হয় যেন অনাদিকাল পর্য্যন্ত চলবে···একটু করে স্বস্তি পাওয়া আবার তার পর মুহূর্ত্তেই অধিকতর বিপদের মধ্যে ডুবে যাওয়া, ঠিক যেমন অবস্থা হয় সাগরে নিমজ্জমান ভগ্নতরী নাবিকের। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই সমস্ত ব্যাপার বোধহয় আমার স্ত্রীর তৈরী করা জিনিস, ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে তিনি যে এতখানি নার্ভাস হয়ে পড়তেন, এটা শুধু আমার ওপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখার একটা ফিকিরমাত্র, তার কারণ দেখেছি, ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে যখনই কিছু গণ্ডগোল বাঁধতো, তখন বাধ্য হয়েই তাঁর কথামত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে সায় দিতে হতো, সেই সূত্রে তাঁর আর আমার মধ্যে বহু দ্বন্দ্বের অবসান আপনা

থেকেই ঘটে যেতো, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনিই জয়ী হতেন। সেইজন্য মনে হতো, তিনি যা কিছু বলতেন বা যা কিছু করতেন, সে-সব যেন একটা পূর্ব্বপরিকল্পিত সুনির্দ্দিষ্ট প্ল্যান-অনুযায়ীই করতেন। কিন্তু আসলে, আমার এ অনুমান ভুলই ছিল। ছেলেদের অসুখ-বিসুখ এবং স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি রাতদিনই মরণান্ত অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যে থাকতেন এবং তাতেই তাঁর জীবন যেন নিঃশেষে তিনি ক্ষয় করে ফেলতেন এবং সেই সঙ্গে আমার জীবনও, আমি মনে করতাম, এই সংসারের জন্যেই আমাকেও বিলিয়ে দিতে হচ্ছে। সাধারণ মা যেভাবে ছেলেপুলেকে খাওয়ানো দাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানোতে জীবনপাত করে, আমার স্ত্রীরও ছেলেপুলেদের জন্যে সেই তীব্র একাগ্র আসক্তি ছিল। পশুরাও ঠিক এমনিভাবে তাদের শিশুদের আঁকড়ে থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ হলো, মানুষের মতন তাদের তো কল্পনা বা বিচারশক্তির কোন বালাই নেই। তারা তার হাত থেকে স্বভাবতই অব্যাহতি পেয়েছে। মনে করুন না, সামান্য মুরগীর কথা···তার বাচ্ছাদের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তার মনে এতটুকু দুশ্চিন্তার অবকাশ নেই, কিসে কিভাবে তার বাচ্ছারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কি করে সম্ভাব্য ব্যাধির হাত থেকে বাচ্ছাদের মুক্ত রাখতে পারা যায়, সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বৃথাই আশা করে যে সে তার সন্তানদের রক্ষা করতে পারে, তার কোন চিন্তাই তার মনে আসে না, তাই তার বাচ্ছারা তার কাছে

আতঙ্কের বস্তু নয়। তার স্বভাবে যা আসে তাই দিয়েই সে তার বাচ্ছাদের দেখাশোনা করে এবং সেইজন্যেই বাচ্ছাদের দেখাশোনা করতে তার অন্তর থেকে ভাল লাগে এবং স্বভাবতই তার বাচ্ছারা তাই তার কাছে শুধু আনন্দের জিনিসই হয়ে থাকে। যখন কোন বাচ্ছা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার কর্ত্তব্য কারুর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে আসতে হয় না, প্রকৃতি স্বয়ং জানিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তার সহজ কর্ত্তব্য কি। তখন সে শুধু অসুস্থ বাচ্ছাটিকে তার কাছে নিয়ে তার নিজের দেহের উত্তাপে তাকে উত্তপ্ত করে রাখে, নিজে কুড়িয়ে এনে তাকে খাওয়ায় এবং তাতেই সে জানে, তার যা করা কর্ত্তব্য সবই সে করেছে। যদি তার সমস্ত যত্নসত্ত্বেও বাচ্চাটি মরে যায়, সে জিজ্ঞাসা করে না, কেন সে মরে গেল, কোথায় বা সে মরে গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে শুধু অস্পষ্ট চীৎকার করে, তারপর থেমে যায়। আবার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে আরম্ভ করে।

কিন্তু হতভাগ্য মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর পক্ষে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দাঁড়ায়। ছেলেদের অসুখ-বিসুখের ব্যাপার ছাড়া, তাদের নিয়ে নানান রকমের সমস্যা নিত্যনতুন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, যেমন ধরুন, কি করে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায়, কি করে তাদের মনকে সত্যিভাবে গড়ে তোলা যায়। এই-সব সমস্যা-সম্পর্কে আমার স্ত্রীর আশে-পাশে রাতদিন অসংখ্য মতামত সব ঘুরে বেড়াতো এবং এক-একটি সমস্যা নিয়ে কত যে পরস্পরবিরোধী মত ও বিধান তাঁদের

শুনতে হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। এইভাবে ছেলেদের এই করা উচিত·· এই এই জিনিস তার জন্যে চাই···অন্য আর কিছু হলে চলবে না; কেউ হয় ত আবার বল্লেন, ওটা অচল··· ওতে চলবে না···এখন এই নতুন নিয়ম হয়েছে···তাতে এটা ওটা সেটা চাই···আর তা না হলে চলবেই না···ইত্যাদি। ছেলেদের পোষাক পরানো, নাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, হাঁটানো, কতটুকু হাওয়া কি-ভাবে কখন তারা নেবে, প্রত্যেক সপ্তাহে এই নিয়ে একটা না-একটা নতুন মতের দেখা মিলতো। যেন পৃথিবীতে শিশুরা এইমাত্র গতকাল থেকে জন্মাতে সুরু করেছে। হয়ত কোন ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কোন গোলমাল হলো কিংবা হয়ত ঠিক সময়ে তাকে স্নান করানো হয় নি, তার জন্যে তার অসুখ হলো। আমার স্ত্রী ভাবতে সুরু করে দিলেন যে, তার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি দায়ী কারণ, যা তাঁর করা উচিত ছিল, যতখানি সাবধানতা তাঁর অবলম্বন করা উচিত ছিল, তা হয়ত তিনি করেন নি।

সুতরাং, ছেলেপুলেরা যখন সুস্থ-অবস্থায় থাকতো তখন তাদের বিঘ্ন বলে মনে হতো; যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়তো তখন জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠতো, মনে হতো যেন নরকে বাস করছি। আমরা একটা সিদ্ধান্ত ধরে নিয়েছি যে, ব্যাধিমাত্রই চিকিৎসা দিয়ে আরোগ্য করা যায় এবং তার জন্যে একটা আলাদা বিজ্ঞান আছে, যার কার্য্য হলো রোগ নিরাময় করা এবং সেই বিজ্ঞানের ভার যাঁদের ওপর অর্থাৎ

যাঁরা সব রোগ নিরাময় করতে পারেন, তাঁরাই ডাক্তার-নামে পরিচিত। অবশ্য প্রত্যেক ডাক্তারই যে সবরোগ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় করতে পারেন, তা নয় কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরা নাকি তা পারেন। তাই ছেলে-পুলের যদি অসুখ হয়, তাহলে সমস্যা দাঁড়ায় কি করে সেই সেরা ডাক্তারের সাহায্য পেতে পারা যায়। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলেই ছেলে বাঁচলো। তিনি আপনি সময়মত তাঁকে না পান, যদি ধরুন তিনি কোন দূর-অঞ্চলে বাস করেন, যেখান থেকে ঠিক-সময়মত তাঁকে আনানো সম্ভব হলো না, তাহলেই সব নষ্ট হয়ে গেল, ছেলেটির জীবন আপনাকে হারাতে হলো। ডাক্তার সম্বন্ধে এই যে অন্ধবিশ্বাস, এ শুধু যে আমার স্ত্রীরই ছিল, তা নয়; আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই এই বিশ্বাস। মাঝে মাঝে এই জাতীয় খোস-গল্প স্ত্রীর কানে এসে পৌঁছত, আহা, বেচারা মিসেস্ এ-র তিন-তিনটে ছেলে মারা পড়লো, ডাক্তার জেড্‌কে ঠিক সময়মত আনানো হয় নি বলে...ডাক্তারের পরামর্শে পেট্রভদরা সময় থাকতে নিজেদের আলাদা করে নিতে পেরেছিল, যে যার আলাদা-আলাদা হোটেলে গিয়ে বাস করার দরুণ এ-যাত্রা ছোঁয়াচ থেকে তারা বেঁচে গেল...যারা আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে পারে নি, তাদের ছেলেপুলেরা মারা গেল...মিসেস্ অমুকের ছোট মেয়েটা খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, ভাগ্যিস্ ডাক্তারের কথা শুনে তারা দক্ষিণ-অঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়েছিল, তাই মেয়েটা আবার

বেঁচে উঠলো।" এই সব কথা শোনার ফলে তাঁর ছটফটানি আরো বেড়ে উঠতো···ডাক্তার আইভান জাকারিয়াভিচ্‌কে যদি ঠিকসময়মত না পাওয়া যায়, যদি ঠিকসময়মত তাঁর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয়, তাহলে ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা কি হবে? কিন্তু ডাক্তার আইভান যে কি ব্যবস্থা কখন দেবেন সে-সম্বন্ধে কারুরই কোন স্থিরধারণা কিছু ছিল না, ডাক্তার আইভ্যান নিজেই সে-সম্বন্ধে কি বলবেন তা তিনি নিজেই জানতেন না কারণ তিনি নিজে বেশ ভালভাবেই জানতেন্ এবং এখনো জানেন যে, এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানেন না, সত্যিকারের কোন সঠিক সাহায্য তিনি করতে পারেন না; তাই একমাত্র কাজ যা তিনি করতে পারেন বা করেন, সেটা হলো কোন রকমে এটা-ওটা-সেটা করে তাঁর সম্বন্ধে রোগীর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখা, যাতে করে লোকে অবিশ্বাস করতে পারে না যে, তিনি যা বলছেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানেন না।

আমার স্ত্রী যদি পুরোদস্তুর পশু-ধর্ম্মী হতেন, তাহলে এই ব্যাপারে নিজেকে এতখানি উদ্‌ব্যস্ত করে তোলবার তাঁর কোন দরকারই হ'তো না। যদি তিনি পুরোদস্তুর মানুষই হতেন, তাহলে ভগবানের ওপর বিশ্বাস করেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, যেমন থাকে অজ্ঞ চাষী-রমণীরা। বিপদ্ যখন ঘনিয়ে আসে, বড় জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা বলে, ভগবান্ দিয়েছেন, তিনিই আবার কেড়ে নিলেন, তাঁর

বিধানই জয়যুক্ত হলো। এই বিশ্বাস যদি তাঁর থাকতো, তাহলে তিনি জানতেন যে, জগতের সব লোকের, তারমধ্যে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরাও আছে, মঙ্গল-অমঙ্গল মানুষের আয়ত্তের বাইরে ভগবানের হাতেই নির্ভর করছে এবং ছেলেমেয়েদের অসুখ নিবারণ করা বা তাদের মৃত্যু আটকানোর কোন ক্ষমতাই যে তাঁর নেই, এই কথাটা বোঝবার জন্যে তাঁকে তখন এইরকম ভাবে মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করতে হতো না। কিন্তু সে-বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাই তাঁর অবস্থা একান্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। জগতের মধ্যে সব চেয়ে দুর্ব্বল অসহায় যে জীবশিশু, যাদের সামনে-পেছনে অগণন বিপদ্ সর্বদাই হাঁ করে আছে, তাদের রচনা করবার ভার যেন তাঁর ওপরই আছে। সেই অসহায় শিশুদের সঙ্গে তীব্র আরণ্যক স্নেহ-প্রবৃত্তি দিয়ে তিনি বাঁধা পড়ে গিয়ে ছিলেন। এই অসহায় শিশুরা তাঁর স্নেহের আওতায় ছিল বটে কিন্তু তাদের কি করে বিপদ্-আপদ্ থেকে দূরে রাখা যায়, তার উপায় তাঁর জানা ছিল না··· সে-উপায় ছিল সম্পূর্ণ অজানা এমন সব লোকদের কাছে যাদের পরামর্শ বা উপদেশ রীতিমত চড়া দাম দিয়ে কিনতে না পারলে পাওয়া যায় না, এমন কি অনেক সময় দাম দিয়েও পাওয়া যায় না। সুতরাং অস্থির হয়ে নিজেকে বিব্রত করে তোলা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না এবং তাই তিনি বিচ্ছেদবিহীনভাবে করতেন। ঠিক যেসময় আমাদের দুজনার মধ্যে ঝগড়ার মিটমাট হয়ে গিয়ে, নতুন করে

শান্তিতে জীবন-যাপন করবার কোন নতুন ব্যবস্থা করছি ...হয়ত একটা ভাল বই নিয়ে পড়তে বসবো, ঠিক সেই সময় হঠাৎ খবর এলো যে ভাসার অসুখ হয়েছে, মেরীর পেটের ভেতর ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, আদ্রির গায়ে না মুখে চুলকুনির মতন কি-সব বেরিয়েছে, ব্যাস, সব ভেঙ্গে গেল...নতুন করে আবার সুরু হলো আত্ম-গ্লানির পালা। শহরের কোন্ অঞ্চলে কোথায় কোন্ ডাক্তার থাকেন, কোন্ বিশেষজ্ঞকেই বা ডাকা যায়, কোন্ ঘরেই বা অসুস্থ ছেলেটাকে আলাদা করে রাখা হবে, এই নিয়ে পড়ে গেল তাড়াহুড়ো আর দুশ্চিন্তা তারপর সুরু হলো আবার সেই অনাদিচক্র, ইন্‌জেক্‌শনের পর ইন্‌জেক্‌শন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেম্পারেচর নেওয়া এবং লিখে রাখা, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন, শিশির পর শিশি, ডাক্তারের পর ডাক্তার এবং এই পর্য্যায় শেষ হতে না হতেই, আবার হয়ত কোথা থেকে হঠাৎ আর একটা কিছু বিপত্তি মাথা তুলে উঠতো,...এইভাবে শান্ত সাংসারিক জীবন যাপন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠলো।

"তা ছাড়া, আর এক কারণে, ছেলেপুলেদের জন্যে আমাদের দুজনের ঝগড়া বাধতো। প্রত্যেকেরই এক একটী ছেলের প্রতি একটা আলাদা টান থাকতো এবং তাকে উপলক্ষ্য করেই দুজনের ঝগড়া জমে উঠতো। আমি সাধারণতঃ আমার বড় ছেলে ভাসাকে এই উপলক্ষে কাজে লাগাতাম, আমার স্ত্রী তাঁর দিক্ থেকে যখন সুযোগ পেতেন, আমার মেয়ে লীজাকে নিয়ে

আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেন। ক্রমশ তারা যখন বড় হয়ে উঠতে লাগলো, তখন আমরা দুজনেই তাদের প্রত্যেককে যে-যার দলের লোক হিসাবে টানতে সুরু করে দিলাম ; শত্রুপক্ষ এবং মিত্রপক্ষ হিসাবে তারাও আমাদের বেছে নিতে শিখলো এবং তাদের এই আনুগত্য বজায় রাখবার জন্যে আমরা দুজনেই চেষ্টার ত্রুটী করতাম না। তার ফলে, তাদের লালন-পালনের যে ত্রুটী ভয়াবহভাবে হতে লাগলো, আমাদের নিত্য সংগ্রামের মধ্যে সেকথা একবারও আমাদের মনে পড়তো না। বড় ছেলেটী অধিকাংশ সময় আমার দলেই যোগদান করতো এবং আমার হয়েই তার মার সঙ্গে ঝগড়া করতো, মেয়েটী যেমন মার মতন দেখতে-শুনতে হয়েছিল, তেমনি আমার বিরুদ্ধে সব সময় তার মার পক্ষই গ্রহণ করতো।

[১৭]

এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে, ক্রমশ আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হয়ে এলো। শেষকালে অবস্থা এরকম দাঁড়ালো যে, আগে যেখানে মত-বিরোধিতার জন্যে শত্রুতা জাগতো, এখন সেখানে শত্রুতার জন্যেই মত-বিরোধিতা জাগতে সুরু করলো। তিনি যে-কোন মতই প্রকাশ করুন না কেন, বা যে কোন বাসনার কথাই জানান না কেন, আমি তার বিরোধিতা করবার জন্যে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েই

থাকতাম এবং তাঁর দিক্ থেকেও তিনি আমার সব ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করতেন। আমাদের বিবাহের চতুর্থ বৎসরে একরকম মনে মনে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পরস্পরকে বুঝে শান্তিতে জীবন যাপন করবার আর কোন আশা বা সম্ভাবনাই নেই, আর কোনদিন আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারবো না; সুতরাং তার জন্যে আর কোন চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনই নেই। সংসারের প্রতিদিনের অতি সাধারণ বিষয়ে আমরা দুজনে সব সময়েই বিপরীত মত পোষণ করতাম এবং প্রাণপণ চেষ্টা করতাম যে যার মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। বিশেষ করে, ছেলে-পুলেদের ব্যাপার নিয়ে। সে-সম্পর্কে আমার যে-সব ধারণা ছিল, আমি জানতাম, সেগুলো এমন কিছু অপরিহার্য্য নয়, যা ত্যাগ করলে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে, কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রী তার বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন, এবং সেই সব মত অস্বীকার করা মানে পরোক্ষভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, সেইজন্যেই আরো বিশেষ করে আমি তাদের আঁকড়ে থাকতাম। আর যাই কিছু তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে করি, ছেলেদের লালন-পালনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারতাম না। তাঁর দিক্ থেকেও, তিনি ঠিক এইভাবেই তাঁর নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এইভাবে আমাকে প্রতিবাদ করে তিনি যথাকর্ত্তব্যই পালন করে চলেছেন, আমিও নিজেকে ভাবতাম, নির্দোষ, আমার ব্যবহারিক চরিত্রে কোথাও

বিন্দুমাত্র ত্রুটী নেই। যখন দুজনে একত্র থাকতে বাধ্য হতাম, তখন দুজনেই কেমন যেন একেবারে নীরব হয়ে যেতাম, এবং মূক-প্রাণীরা যেভাবে নীরবে কথাবার্ত্তা চালায়, অনেকটা সেইভাবেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।

'এখন ক'টা বাজতে পারে': 'শুতে যাবার সময় বোধহয় হলো'…"আজ রাত্তিরে ডিনারে কি খাওয়া যেতে পারে? কোথায় এখন যাওয়া যায়? আজকের কাগজ কি পড়া হয়েছে? ডাক্তারকে কি ডেকে পাঠাতে হবে? মেরীর গলায় ব্যথা করছে"…

এই জাতীয় কথোপকথনের বাইরে যদি কখন ভুলে এক-পা বেশী বাড়িয়েছি, অমনি ঝুড়ি-চাপা ঝগড়া মাথা তুলে ফোঁস্ করে উঠেছে। হয়ত সামান্য কফি খাওয়া নিয়ে, কিম্বা হয়ত টেবিলের ঢাকনাটা কিম্বা খেলার তাস-জোড়া তাতেই হাতাহাতি লেগে যেতে পারে; কিংবা তিক্তকথার বাণ দুদিক থেকে সমানে ছুটতে পারে। অর্থাৎ যে সব জিনিসের সঙ্গে জীবনের বিশেষ কোনই যোগ নেই, তাতেই এই অনর্থক ঝগড়া জেগে উঠতে পারে। আমার নিজের দিক্ থেকে আমি বলতে পারি, আমার স্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় আমার শিরা-উপশিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটতো। অতি তুচ্ছ ব্যাপার, হয়ত তিনি চা ঢালছেন, কিম্বা কাজ করতে করতে পা দোলাচ্ছেন, খাবার জন্যে মুখে চামচে তুলছেন, ঠোঁট সরু করে চা আস্বাদন করছেন, তাতেই আমার মন ঘৃণায় ভরে উঠতো, যেন প্রত্যেকটী কাজের আড়ালে একটা

মারাত্মক কোন অন্যায় তিনি করে চলেছেন। সে-সময় কিন্তু আমি লক্ষ্য করি নি যে, এই সব ঘৃণার লগ্নগুলি ঠিক নিয়ম করে পর্য্যায় মাফিক আসতো এবং যাকে আমরা বলি প্রেম, সেই প্রেমের—সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

কোন্ সময়ে কতটা উত্তাপের মাত্রা হবে, তারও যেন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের এক পালা হয়ে যাবার পরই আসতো ঘৃণা করার পালা। যে-বার প্রেমটা একটু বেশী হতো, সেবার অনুবর্ত্তী ঘৃণার পালাটা দীর্ঘতর হতো। যেবার ঘৃণার পালাটা তেমন জোরালো হতো না, তার পরবর্ত্তী প্রেমের পালাটাও সেবার তেমন তীব্র হতো না। সে-সময় আমরা জানতাম না যে, এই প্রেম আর ঘৃণা, এ দুটোই হলো একই প্রবৃত্তির দুটো আলাদা দিক্ মাত্র।

যদি সেদিন নিজেদের মনের অবস্থার কথা বুঝতে পারতাম, তাহলে জীবন-ধারণ করে থাকা এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে উঠতো। কিন্তু সেদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি। যারা অসংযত জীবন যাপন করে, এইটেই হলো তাদের মুক্তির পথ, আবার এইটেই হলো তাদের শাস্তি। তারা ইচ্ছা করেই তাদের মনের সামনে একটা মেঘের কুণ্ডলী সৃজন করে, তাদের জীবনের সেই ভয়াবহ দৈন্যকে আচ্ছাদন করে রাখবার জন্যে এবং আমরা সেইভাবেই নিজেদের চোখের উপর নিজেরাই ঠুলি তৈরী করে জীবন-যাপন করে চলেছিলাম। জীবনের সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে ভুলে থাকবার জন্যে আমার

স্ত্রী সমগ্র মন দিয়ে সংসারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করতেন, বাড়ীর আসবাব-পত্র, ছেলেমেয়েদের পোষাক, তাদের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য, এই নিয়েই তিনি অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতেন। আমার দিক্ থেকেও নিজেকে ব্যস্ত রাখার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম। সেটা হলো আমার নেশা। আমার প্রতিদিনের কাজের নেশা, খেলার নেশা, তাসের নেশা। এইভাবে আমরা দুজনেই যে-যার নিজের কাজে-সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকতাম এবং যে-যার কাজের নেশায় যতখানি মেতে থাকতাম, ঠিক ততখানি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখতাম।

মাঝে-মাঝে আমি নিজে নিজেই বলতাম, "তুমি তো মুখ ভার করে দিব্যি আছ, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছ কাল সারারাত ধরে তুমি যে-সব কাণ্ড-কারখানা করেছ, তার দরুণ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে এবং এই মানসিক অবস্থায় এখন আমাকে কমিটীর সভায় যোগদান করতে যেতে হবে।" স্ত্রীর দিক্ থেকে, তিনি যে শুধু মনে-মনেই ভাবতেন, তা নয়, জোরগলায় প্রকাশ্যভাবেই বলে উঠতেন, "তোমার তো ভাবনা-চিন্তার কোন বালাই নেই, কাল সারারাত ছেলেটাকে নিয়ে একবারও চোখের পাতা এক করতে পারি নি।"

স্নায়বিক দুর্বলতা, হিস্টিরিয়া, হিপ্‌নটিজিম্ এবং ঐ জাতীয় ব্যাপার নিয়ে যে-সব নতুন-নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সে গুলো যে শুধুই একটা অবাস্তর অসম্ভব ব্যাপার, তা নয়,

সেগুলো হলো রীতিমত পেজোমি, মারাত্মক উদ্ভুটে ব্যাপার। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যদি চারকোর কাছে আমাদের দুজনের ব্যাপার উপস্থিত করা হতো, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহাতীতভাবে আমার স্ত্রীকে বলতেন হিষ্টিরিয়া-ব্যাধিগ্রস্ত এবং আমাকে বলতেন, "এ্যাব্-নরম্যাল্," অর্থাৎ আমার স্নায়ু আর প্রবৃত্তি-কেন্দ্রগুলি সাধারণ লোকের তুলনায় স্বতন্ত্র এবং তক্ষুণি তার চিকিৎসা স্বরু করে দিতেন। আসলে কিন্তু, ওষুধ দিয়ে সারাবার মত কোন ব্যাধিই আমাদের মধ্যে ছিল না।

এইভাবে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন ধোঁয়া আর কুয়াসার মধ্যে বাস করে চলতে লাগলাম, কোথায় আছি, কেমন আছি, তা দেখবার বা বোঝবার কোন বাসনা আমাদের ছিল না। এবং পরে যে ঘটনা একদিন ঘটে গেল, সেদিন যদি তা না ঘটতো, তাহলে হয়ত বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত এই ধারণা নিয়েই বেঁচে থাকতাম যে, খুব উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও, ব্যক্তিগতভাবে রীতিমত একটা নিষ্কলুষ জীবনই আমি যাপন করে চলেছি। অন্ততঃ আমার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, এটা আমার স্পষ্ট ধারণাই ছিল। হীনতা আর জঘন্য মিথ্যার যে সমুদ্রতলে আমি অসহায়ভাবে ডুবে চলেছিলাম, তার কোন অস্তিত্বই তখন বুঝতে পারতাম না। আমরা দুজনে ছিলাম, একই শৃঙ্খলে বাধা দুজন কারাবন্দীর মতন, তাদেরই মতন সেই শৃঙ্খলের টানে পরস্পর পরস্পকে ঘৃণা করতাম। পরস্পরের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলতে পরস্পরের চেষ্টার কোন ক্রুটী ছিল না। কিন্তু সেদিকে আমরা

দুজনেই চোখ বন্ধ করে থাকতাম। তখন আমি জানতাম না যে শতকরা নিরানব্বুই জন বিবাহিত লোক এই-জাতীয় একই নরকবাস ভোগ করে। এই জাতীয় নরকে আমি যে নিজে ডুবে আছি, সেকথা আমি নিজেই তখন জানতাম না, তাই অপরের সম্বন্ধেও তা চিন্তা করতে পারতাম না।

বাঁধা-ধরা সাধারণ জীবনই হোক কিংবা কোন অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনই হোক, তার মধ্যে লক্ষ্য করলে একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখা যায় ঘটনা-সংযোগের বিচিত্র নিয়ম। উদাহরণ-স্বরূপ ধরুন, ঠিক যে মুহূর্ত্তে স্বামী-স্ত্রীর জীবন পরস্পরের চেষ্টাতে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় দরকার পড়লো, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে শহরে গিয়ে থাকার···সেখানে নাকি সুশিক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা সব আছে।”

হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে নির্ব্বাক্ হয়ে বসে থাকে। গলায় সেই অদ্ভুত আওয়াজ আবার শোনা যায়, শুনলে মনে হয় যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। ট্রেন তখন একটা ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ক'টা বেজেছে এখন?

ঘড়িতে দেখলাম, তখন রাত দুটো।

জিজ্ঞাসা করে বসলো, আপনার ক্লান্তিবোধ হচ্ছে না?

বল্লাম, না, আমার তো তা বোধ হচ্ছে না, তবে মনে হয় আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

বল্লো আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে···মাফ করবেন, সামনের স্টেশনে একটু নেমে জল খেয়ে আসবো···

স্টেশনে এসে গাড়ী থামতেই ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। একলা বসে মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছি, ভদ্রলোক এতক্ষণ যা বল্লেন এবং ভাবতে-ভাবতে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ভদ্রলোক কখন পেছনের দরজা দিয়ে আবার আসনে এসে বসেছেন, তা লক্ষ্যই করি নি।

[১৮]

"আমি জানি, আমার আসল বক্তব্য থেকে আমি বারবার সরে গিয়ে অন্য কথা বলছি কিন্তু আসল কথা কি জানেন? সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে এতদিন ধরে···আর এমন গভীরভাবে আমি চিন্তা করেছি যে, আজ অনেক ব্যাপার আমি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে শিখেছি এবং সেইজন্যে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটি-নাটি শুদ্ধ আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই!

হাঁ, যে কথা বলছিলাম, গাঁ ছেড়ে আমাদের শহরে চলে আসতে হলো। যাদের মনে শান্তি নেই, তারা গাঁয়ের চেয়ে শহরের আলো-বাতাসে তবু খানিকটা জোর করে নিঃশ্বাস নিতে পারে। একশো বছর ধরে একজন লোক শহরে বাস করে যেতে পারে, অথচ একদিনের জন্যেও তার মনে হবে না যে, ভেতর থেকে বহুদিন হলো সে মরে গিয়েছে···তার গা থেকে পচা

মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখবার সময় তার নেই, সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত···সমাজে যাওয়া-আসা আছে, নানান্ রকমের কর্ত্তব্য আছে...নানান্ শিল্প-সামগ্রী, ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, শতেক রকমের কাজ। এই সব ব্যাপারে অষ্ট-প্রহর লোক-জন আসা-যাওয়া করে, তার বদলে তাকেও সেই সব লোকের বাড়ী গিয়ে হাজির হতে হয়, অমুক লোকের সঙ্গে দেখা করা, অমুকের কি বক্তব্য তা শোনা ···হাজার রকমের ভব্যতার দায়িত্ব। শহর মাত্রেই একজন না একজন স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থাকেন, কোথাও বা এক-জনেরও বেশী থাকেন, সেই শহরে থেকে তাঁদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করবার চেষ্টা না করা নিদারুণ কর্ত্তব্যহানির মধ্যেই গণ্য হয়। তা ছাড়া, এটা-সেটা শরীরের নানান্ অসুবিধা আছে, শহরে যখন প্রত্যেক বিষয়ের একজন করে আলাদা বিশেষজ্ঞ আছেন, তখন তাঁদের কাছে পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্মে না যাওয়া মূর্খতারই সামিল। নিজের না হয়, অন্ততঃ ছেলেদের জন্মেও তা করতে হয়। তার ওপর, ছেলেদের স্কুলের মাস্টার, গৃহশিক্ষক বা গভর্ণেস আছেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা-শোনা করতে হবে বৈকি! এই সমস্ত ব্যাপারের যোগফল যা দাঁড়ায়, সেটা হলো একটা শূন্যগর্ভ বিরাট মিথ্যাচার।

আমাদের প্রতিদিনের একত্রবাসের ফলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হতো, ক্রমশঃ শহর-বাসের ফলে তার অনুভূতির তীব্রতা কমে আসতে লাগলো। গাঁ থেকে শহরে এসে বসবাস স্থাপন করার

মধ্যে প্রথম-প্রথম একটা মধুর আনন্দের অবকাশ পাওয়া যায়, চিত্ত-বিনোদনের একটা নতুন উপায়…নতুন বাড়ীতে জিনিস-পত্র গোজ-গাজ করা, সাজানো…এবং তার জন্যে গাঁ আর শহরের মধ্যে দিনকতক যাতায়াত করা, এর মধ্যে মানসিক যন্ত্রণার কথাটা আপনা থেকেই খানিকটা চাপা পড়ে যায়।

শহরে আসার পরের বছরের শীতকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা না ঘটলে হয়ত আমার পরবর্ত্তী জীবনের কোন ঘটনাই আর সম্ভব হতো না। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব ক্ষণ-ভঙ্গুর ছিল, তাই হতভাগা পাজী ডাক্তারগুলো তাঁকে নিষেধ করলো, যেন পুনরায় আর তিনি গর্ভবতী না হন এবং কি করে সেই আদেশ তিনি পালন করতে পারেন, তার ব্যবস্থাও তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জঘন্য বিসদৃশ লাগলো এবং প্রতিবাদ করলাম কিন্তু আমার কথা বা পরামর্শ তিনি একেবারেই কানে তুল্লেন না…ডাক্তারদের কথা তাঁকে মেনে চলতেই হবে। চাষীদের কাছে ছেলের প্রয়োজন আছে, যদিও ছেলেপুলে মানুষ করতে তাদের রীতিমত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কিন্তু যেহেতু তাদের ছেলের দরকার, সেই হেতু তাদের স্ত্রী-সহবাসে কোন বাধা নেই। আমাদের পক্ষে, যাদের দু'একটি ছেলে-মেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাদের পক্ষে ছেলের আর কোন সার্থকতা নেই। পরিবর্ত্তে, নতুন সন্তান হওয়া মানে নতুন ঝঞ্ঝাট, অর্থের দিক্ থেকে তো বটেই। এককথায়, তারা হলো একটা ভার। সুতরাং আমরা যে জীবন যাপন

করি, তার কোন সার্থকতা নেই। হয়, কৃত্রিম উপায়ে ছেলে হওয়ার দায় থেকে মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে, নতুবা, তার চেয়ে যা অধিকতর কুৎসিত, তাদের মনে করতে হবে দুর্ভাগ্য বলে, শুধ্ আমাদের দায়িত্বহীনতার ফল। কিন্তু এই কথা চিন্তা করার কোন অধিকারই আমাদের নেই। নৈতিক বিচারের দিক্ থেকে আজ আমরা এতদূর অধঃপতিত হয়েছি যে, নৈতিক অভাবের কোন বোধই আমাদের নেই। আমাদের সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক উপরিউক্ত মতবাদের কাছে এরকমভাবে আত্মসমর্পণ করেছে যে, তাঁরা অন্তরে বিবেকের বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ অনুভব করেন না। এ সম্পর্কে কোন অনুশোচনার সম্ভাবনাও আশা করা যায় না; কারণ আমাদের জীবনে বিবেক বলে কোন জিনিসের অস্তিত্বই আজ নেই। বিবেক বলতে আমরা একমাত্র জিনিস যা আজ বুঝি, সেটা হলো জনমতের চেতনা, ফৌজদারী আইনের গণ্ডীর মধ্যে যা আবদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে কারুরই অনুশোচনায় বিদ্ধ হবার কোন কারণ থাকে না। সমাজে মুখ দেখাতে কারুরই লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ সকলেই এই কাজ করে থাকেন।…মিসেস্ পি… আইভান জেকেরেভিচ…সকলেই। ফৌজদারী আইনকেও ভয় করবার কিছু নেই। গাঁয়ের কুৎসিত মেয়েগুলো আর যারা সৈনিকের স্ত্রী, তারাই তাদের নব-জাত শিশুদের পুকুর বা পাতকূয়ার মধ্যে বিসর্জ্জন দেয় এবং এই জাতীয় ভয়ঙ্কর

চরিত্রের মেয়েদের আইনতঃ সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়, নিশ্চয়ই খুব উচিত বিধান। কিন্তু আমরা শহরে, এ সব ব্যাপার রীতিমত ভব্যভাবে করি, সম্মান বজায় রেখে করি।

দেখতে-দেখতে আরও দুবছর কেটে গেল; তার মধ্যে দেখা গেল, ডাক্তাররা যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছিলেন, তার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। আমার স্ত্রীর চেহারা আগের থেকে ঢের ভাল হলো; আগের থেকে ঢের বেশী মোহনীয় হয়ে উঠল তাঁর রূপ, শীতান্ত দিনের মাধুর্য্যের মত। সে-কথা তিনি নিজেও জানতেন এবং সেইজন্যে নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করছিলো। এক ধরণের রূপ আছে, যা আকর্ষণ করে, অপরের অন্তরে আলোড়ন এনে দেয়, আমার স্ত্রীর মধ্যে সেই রূপ ফুটে উঠতে লাগলো। ত্রিশ বছরের যে নারী, সু-খাদ্য ও জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যে যে গড়ে ওঠে, যাকে সন্তান- পালনের কোন ঝামেলা বা দায়িত্ব ভোগ করতে হয় না, তার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে, আমার স্ত্রীর মধ্যেও তা দেখা দিল। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই চুম্বকের মতন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এতকাল ধরে যে খেয়ালী ঘোড়াকে লাগামের টানে বয়ে আসতে হয়েছে, হঠাৎ যদি তার লাগাম সরিয়ে নিয়ে তাকে দুবেলা বসিয়ে রীতিমত-ভাবে খাওয়ানো-দাওয়ানো হয় এবং আস্তাবলে তাকে অলস করে রেখে দেওয়া হয়, তার যে অবস্থা হয়, আমার

স্ত্রীরও সেই রকম অবস্থা এসে দাঁড়ালো। আমাদের শতকরা নিরানব্বুই জন স্ত্রীলোকের ওপর যেমন কোন সংযম-শাসনের ব্যবস্থা নেই, আমার স্ত্রীর ওপরও তেমনি কোন শাসনের বন্ধন আর রইলো না। সেকথা বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে মন আতঙ্কে ভরে উঠলো।”

[১৯]

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ক্ষমা করবেন,—আপনার মনে যেন বলে ওঠেন। তারপর তিনচার মিনিট ধরে সেই অবস্থায় জানালার বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আমার সামনের আসনে এসে বসলেন।

মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো যেন, হঠাৎ মুখটা বদলে গিয়েছে। চোখে এক সকরুণ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি ফুটে উঠেছে।

“একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার কাহিনী আমি বলবোই। এখনো যথেষ্ট সময় আছে, এখনো ভোর হয় নি।”

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করলেন, হাঁ, আমার স্ত্রীর দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। যেদিন থেকে সন্তান-হওয়া বন্ধ করেছিলেন, সেদিন

থেকে একটু স্থূলকায়াও হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই ব্যাধি—ছেলেমেয়েদের নিয়ে অষ্টপ্রহর দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকা—সেটাও অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। মনে হলো তিনি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

হাঁ, তাঁকে দেখে তখন মনে হতো, যেন তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন, যেমন সচেতন হয়ে ওঠে মাতাল পান-উন্মত্ত রাত্রির পরের দিন সকালবেলা, বুঝতে পারে না সুরার অচেতন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কখন বিধাতার একটা সম্পূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তেমনি যেন কিসের উন্মাদনায় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, একটা সুন্দর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা…যে-সম্ভাবনা সেই মুহূর্ত্তে তাঁর ধারণায় তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। "আমি এবার থেকে চেষ্টা করবো যাতে এই সুখ-সম্ভাবনা আর ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে না পারে ঃ সময় অতিক্রত ছুটে চলেছে…এ সুযোগ চলে গেলে আর সুযোগই আসবে না।" আমি অন্ততঃ তখন মনে করতাম যে, আমার স্ত্রী ঐ রকমই কিছু ভাবছেন বা অনুভব করছেন। এ ছাড়া যে তাঁর অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা হতে পারে না, সে-সম্বন্ধে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়। কারণ যে-শিক্ষা তিনি পেয়ে এসেছিলেন, তাতে মনে একমাত্র ধারণাই জন্মাতে পারে যে, জগতে কামনা করবার মতন একটীমাত্র জিনিস আছে এবং সে জিনিস হলো তথাকথিত "প্রেম"। বিবাহের মধ্যে দিয়ে তিনি অবশ্য সেই প্রেমের কথঞ্চিৎ

আস্বাদ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁর কামনার তুলনায় তেমন কিছু বেশী নয়...যতটা পাওয়া যেতে পারে বলে নিজের মনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের কম। তা ছাড়া বিবাহের মধ্যে দিয়ে আসার দরুণ, তাঁকে বহু ব্যর্থতা, বহু আশা-ভঙ্গের বেদনা এবং যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, বিশেষ করে সন্তান-হওয়ার যন্ত্রণা যা তাঁর কুমারী-স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। শেষোক্ত যন্ত্রণায় তিনি ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন ; অবশেষে সদাশয় ডাক্তারেরা এসে মাতৃত্বের যন্ত্রণা থেকে কি করে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তা তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে বাঁচালেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ডাক্তারদের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন এবং সেই ব্যবস্থার ফলে কালক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। পুনরুজ্জীবিত হয়ে বুঝলেন, বেঁচে যদি থাকতে হয়, তাহলে একমাত্র প্রেমের জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু ঈর্ষ্যা আর ঘৃণায় যে স্বামীর সঙ্গ তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সে-স্বামীর সঙ্গে প্রেমের সম্ভাবনা তিনি কল্পনাই করতে পারলেন না, তাই তিনি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, নতুন কোন প্রেমের, যে প্রেম হবে তাঁর মতে আদর্শ বিশুদ্ধ প্রেম। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশার অস্পষ্ট কামনায় তিনি চারদিকে কৌতুহলী হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, অন্ততঃ আমি তখন তাই মনে করেছিলাম। আমি এই ব্যাপারটা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম এবং তার দরুণ

আমার মনে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হলো, তাকে নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। বিশেষ করে যখন জানলাম, সেই সময় তিনি যখনি কোন সুযোগ পেতেন, তখনি অপর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এই জাতীয় কথারই উল্লেখ করতেন, উদ্দেশ্য যাতে সেই সব কথা অপর লোকের মারফৎ আমার কানে এসে পৌছয়। অথচ আমি জানি, তার একঘণ্টা আগে তিনি ঠিক তার উল্টো কথাটাও বলতে পারতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রায়ই বলতেন, খানিকটা রহস্য করে, খানিকটা গম্ভীরভাবে, যে ছেলেপুলেদের জন্যে মায়ের এই আকুতি, এটা একটা নিছক ভ্রান্তি, বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ সুখের স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ছেলেপুলেদের জন্যে নিজের যৌবনকে বিসর্জ্জন দেওয়া দুর্ভাগ্যেরই কথা। ছেলে-পুলেদের দেখাশোনা করার আগ্রহও সেই সময় তাঁর কমে আসতে লাগলো···তার বদলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর দিতে লাগলেন, যদিও সে-ব্যাপারটা চেষ্টা করতেন সংগোপন করে রাখতে। সেই সঙ্গে নিজের সাধ-আহ্লাদ সম্বন্ধেও তিনি রীতিমত সজাগ হয়ে উঠলেন; যৌবনে যে-সব বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন নি, এখন আবার নতুন করে তার দিকে নজর দিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, তিনি আবার নতুন করে সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলনে মন দিলেন, এক সময়ে তিনি অল্প-বিস্তর কৃতিত্বের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে পারতেন। আমার জীবনের সেই মহা-

বিপত্তির প্রথম সূত্রপাত এই ব্যাপার থেকেই শরীরী হয়ে উঠলো।”

হঠাৎ আবার জানলার দিকে ফিরে কিছুক্ষণ বাইরে শূন্য-ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো; বেশ বুঝলাম মনে-মনে চেষ্টা করছে আত্ম-সংবিৎ বজায় রাখবার জন্যে।

“হাঁ, এই উপলক্ষ্যেই সেই ব্যক্তিটী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন।”

কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যেতে লাগলো, গলার ভেতর থেকে দুবার শুনলাম তাঁর সেই বিচিত্র আওয়াজ। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সেই লোকটীর নাম উচ্চারণ করতে অথবা তার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে তাঁর রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। ভেতর থেকে কি যেন একটা বাধা তাঁকে নীরব করে রাখতে চাইছিল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় সে-বাধার বেড়া ভেঙ্গে বুক বেঁধে আবার বলতে সুরু করলেন,

“আমার মতে লোকটা অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির ছিল। আমার জীবনে সে যে-বিপর্য্যয় আনে, তার জন্যেই যে তাকে এই ভাবে দেখছি, তা নয়, সত্যিই লোকটা স্বভাবতই হীনপ্রকৃতির ছিল। সেই লোকটা যে এতখানি অপদার্থ ছিল, তা থেকে শুধু বোঝা যায় যে আমার স্ত্রীও কতখানি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। যদি সে-লোকটা না আসতো, আমি জানি, আর একজন কেউ হয়তো জুটতো। ব্যাপারটা যে এই রকম হবে, তা ভাগ্যেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।”

আবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে ভদ্রলোক নীরব হয়ে যায়।

"লোকটা সঙ্গীত নিয়ে চর্চ্চা করতো...বেহালা বাজাতো... খানিকটা ওস্তাদ ধরণের, খানিকটা সৌখীন বাজিয়ে। তার বাবা জমিদার-শ্রেণীরই লোক, আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল...বহুদিন আগেই তিনি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে নিঃসম্বল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটার তিন ছেলে, প্রত্যেক ছেলের জন্যে এ-দিক্ ও-দিক্ থেকে তিনি আলাদা-আলাদা বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে প্যারিসে তার ধাই-মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে ছেলেটা একাডেমী অফ্ মিউজিকে ভর্ত্তি হয়; কারণ তার নাকি সঙ্গীতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেখান থেকে পাস করে স্টেজের কন্‌সার্টে বেহালাবাদকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করতো। আসলে লোকটা ছিল যাকে বলে..."

একটা অতি ক্রূর মন্তব্য করতে গিয়ে পদ্‌নিসেফ্ বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে নিলো এবং এই আত্মসংবরণের চেষ্টার ফলে ঝড়ের মত দ্রুত সে আবার বলে চল্লো,

"আমি অবশ্য জানতাম না, লোকটা সে-সময় কি-ভাবে জীবন-যাপন করতো; শুধু এইটুকু জানি যে, সেই বছর সে রাশিয়ায় ফিরে আসে এবং আমার বাড়ীতেই তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বাদামের মতন গড়ন, ভিজে-ভিজে চোখ, লালরঙের মুখ, ঠোঁটের কোণে হাসি ..মোম দিয়ে সরু-করা গোঁফ, হালফ্যাসানে মাথার চুল কাটা;

মিষ্টি-মিষ্টি ভালমানুষী মুখ, যে-ধরণের মুখের চেহারা দেখে মেয়েরা বলে, দেখতে মন্দ নয়। ছিপছিপে গড়ন, বেমানান নয়। অবস্থা বুঝে লোকটা একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে যেতে পারতো, অথচ যদি দেখতো যে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বা যাবে না, তক্ষুণি কিন্তু নিজের মর্য্যাদা বজায় রেখে থেমে যাবার কায়দাও ষোল-আনা জানতো। প্যারিসের হাল-ফ্যাসান-অনুযায়ী পায়ে বোতাম-আঁটা বুট, গলার নেকটাই সব সময়ই উৎকট কড়া-রঙের অর্থাৎ আমার বক্তব্য হলো, বিদেশীরা প্যারিসে গিয়ে যে-সব ছোট-খাট বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে প্রলুব্ধ হয়, লোকটা পুরা-মাত্রায় তা নিজের অঙ্গে বহন করে আনে। মেয়েরা এইসব ফ্যাসানের নতুনত্বে অতি সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং তাদের চোখে এইসব ফ্যাসানধারীরা উন্নততর জীব বলে প্রতিভাত হয়। ব্যবহারিক দিক্ থেকে লোকটার মেজাজ সব সময়ই খুব নরম আর মোলায়েম ছিল। পুরাণো নজীর উল্লেখ করে কথা বলবার একটা কায়দা লোকটার ছিল… টুকরো-টুকরো কথা এমনভাবে অসমাপ্ত রেখে বলতো যে, তার বাকিটা আপনি যেন অনায়াসে তার হয়ে বলে দিতে পারেন, সে যে সম্বন্ধে কথা বলছে, আপনি যেন সে-সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন, তার টুকরো কথা থেকে যেন বাকি কথাগুলো আপনা থেকে আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই সেই ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীত নিয়ে আমার

পথে এসে দাঁড়ালো এবং এই হলো আমার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত ঘটনার মূল কারণ।

আদালতে আমার বিচারের সময়, মামলার সমস্ত ব্যাপার এমনভাবে জুড়ে সাজানো হয়েছিল যাতে বোঝা যায় যে, আমি ঈর্ষ্যার জ্বালায় আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি তা নয়—এর মধ্যে আরো অনেক জিনিস আছে, যেগুলোকে বাদ দিয়ে ধরা যায় না। বিচারকদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আমার স্ত্রী আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন এবং আমার লাঞ্ছিত আত্মসম্মান-বোধকে রক্ষা করবার জন্যেই আমার স্ত্রীকে আমি খুন করতে বাধ্য হই এবং সেইজন্যেই আমি মুক্তি পাই। বিচারের সময় আমার দিক্ থেকে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম, সত্যি যা ঘটেছিল, অকপটে তাই প্রকাশ করতে; কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টাকে তাঁরা অন্য অর্থ করলেন, তাঁরা ভাবলেন আমার স্ত্রীর সুনামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা থেকেই আমি সেই সব কথা বলছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই বাজিয়ে-লোকটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক, সত্য-মিথ্যা যাই ঘটে থাকুক না কেন, তাতে আমার বা আমার স্ত্রীর কিছুই যায় আসে নি। আসল যে জিনিসটা এর মধ্যে ছিল, তা আপনাকে ইতিপূর্ব্বে বলেছি। এবং সেটী হলো, কার্য্য-কারণের সংযোগে আমার আর আমার স্ত্রীর মাঝখানে যে অতলস্পর্শী গভীর গহ্বর প্রতিনিয়ত

গভীরতর হয়ে উঠছিল, তারি সৃষ্টি। পরস্পরের ঘৃণার সেই নিদারুণ ভয়াবহ মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সামান্ত একটা স্ফুলিঙ্গই এই অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট হতো। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় নিত্য ঘটনা হয়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেকবারই তা বীভৎসতর হয়ে দেখা দিত এবং প্রত্যেকবারই তার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটতো তীব্র কামের উৎপীড়নে। যদি সে লোকটা আমাদের মাঝখানে না আসতো, অন্য যে-কোন লোক এলেও অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত এমনি নিখুঁতই হতো। ঈর্ষ্যার উপলক্ষ যদি না থাকতো, অন্য যে-কোন উপলক্ষ আবিষ্কার করলেও চলতো। আমি যে-কথা জোর করে বলতে চাইছি, সেটা হলো যে-সব স্বামী আমার মতন জীবন-যাপন করে, শিগ্‌গিরই হোক অথবা দেরীতে হোক্, একদিন না একদিন তাদের হয় আত্ম-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতে হবে, নতুবা স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বাস করতে হবে, নইলে হয় আত্মহত্যা করে মরতে হবে, নতুবা আমি যা করেছি, তাই করতে হবে অর্থাৎ স্ত্রীদেরই খুন করতে হবে। যদি এমন কোন লোক দেখতে পাওয়া যায়, যাদের জীবনে এর কোনটাই করবার দরকার হয় নি, তাহলে বুঝতে হবে, তারা হলো ব্যতি-ক্রম, কালেভদ্রে সে-রকম দু'-একটা উদাহরণ হয়ত দেখতে পাওয়া যায়। যেভাবে ঘটনার পরিসমাপ্তি আমি ঘটাই, তার আগে বহুবার আমি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলাম, আমার স্ত্রীও কয়েকবার বিষ-খাবার আয়োজন করেছিলেন।"

"শেষ বিপত্তি ঘটবার ঠিক আগে, ঐ জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটে যায়। ঝগড়া-ঝাঁটি মিটমাট হয়ে যাবার সময়, একবার আমরা খুব অল্পসময়ের জন্যে একটা শান্তির যুক্তি করে বসবাস করছিলাম। সেই শান্তি-ভঙ্গের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে আমরা একটা কুকুরকে নিয়ে একদিন আলোচনা করছিলাম; কুকুরটা, আমি বল্লাম, এক্‌জিবিশনে একটা মেডেল পেয়েছিল। তিনি প্রতিবাদ করে বল্লেন, না, মেডেল পায় নি, তবে ভাল বলে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিল এবং তাই থেকেই আবার দুজনের মধ্যে ঝগড়া স্থুরু হয়ে গেল···এক বিষয় থেকে আর এক বিষয় নিয়ে, প্রত্যেক পদে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের অভিযোগও বেড়ে চল্লো। "হ্যাঁ, হাঁ, সে কথা আমি অনেক কাল আগেই জেনেছি ··জানি, আজকাল তুমি তো ঐ রকম বলবেই!" "না, আমি বলি নি, বলেছ তুমি নিজে!" "না, আমি, ও সব কিছুই বলি নি।" "তাহলে বলতে চাও, আমি মিথ্যাবাদী?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে ব্যাপারটা এমন উগ্র হয়ে উঠলো যে, আর এক মিনিট পরেই, মনে হলো, এমন হাতাহাতি স্থুরু হয়ে যাবে, যাতে হয় মরতে হবে, না হয় মারতে হবে। আপনি স্পষ্ট বুঝছেন এখুনি সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্ত ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, এবং তার আতঙ্কে মন শিউরে ওঠে···প্রাণপণে হয়ত চেষ্টা করবেন

নিজেকে সংবরণ করে রাখতে, কিন্তু কোথা থেকে ঘৃণার তরঙ্গে সমস্ত চেতনা ডুবে যায়। তাঁর অবস্থা হয়ত আমার চেয়ে আরো বেশী খারাপ হয়ে এসেছিল, আমি যা-কিছু বলি না কেন, তার একটা কদর্থ তিনি করবেনই এবং তাঁর প্রত্যেক কথাটা তখন বিষ-মাখানো হয়ে যায়। আমার অন্তরের যে-সব পুরাণো ক্ষত ছিল এবং যার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, ইচ্ছে করেই তিনি এমন সব কথা বলতেন, যাতে করে সেই সব ক্ষত থেকে আবার রক্ত ঝরে পড়ে। এইভাবে ঝগড়া ক্রমশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। অবশেষে আমি চীৎকার করে উঠে আদেশ করি, চুপ্ কর! ঘর থেকে ছুটে তিনি বেরিয়ে যান, আমিও তার পিছু-পিছু ছুটি তাঁকে ধরে থামাবার জন্যে।

জামার অংশ ধরে তাঁকে টেনে ধরতেই তিনি এমন ভঙ্গী করে ওঠেন, যেন আমি তাঁকে প্রহার করছি। চীৎকার করে ছেলেদের ডাকেন, ওরে! তোদের বাবা আমাকে মারছে দেখ! আমি আরো গলা বার করে চীৎকার করে উঠি, খবরদার, মিথ্যাকথা বলো না! তিনিও ঠিক তেমনি উঁচু গলায় জবাব দেন, বলি, এই তো আর প্রথমবার নয় যে, তুমি এরকম করছো! ছেলেগুলো ছুটে তাদের মার কাছে আসে। তিনি তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন আর আমি চীৎকার করে বলি, খুব হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না! "তোমার কাছে সবই তো ন্যাকামি। মানুষকে তুমি স্বচ্ছন্দে

খুন করে বলতে পার যে, সে ন্যাকামি করে মরে পড়ে আছে! আমার আর তোমাকে চিনতে বাকি নেই···আমি জানি, আমাকে খুন করতেই তো তুমি চাও!”

উত্তরে আমি চীৎকার করে বলে উঠি, মরলে তো বাঁচি! যেমন মরে পড়ে থাকে রাস্তার কুকুরগুলো! আমার মুখ থেকে সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত কথা যে কি করে বেরিয়ে পড়লো, ভাবতেই আমি নিজে অবাক হয়ে গেলাম। বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ছুটে আমার পড়বার ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম এবং সিগারেটের পর সিগারেট খেতে লাগলাম। সেখান থেকে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, পাশের ঘরে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আয়োজন করছেন। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? তাঁর দিক্ থেকে কোন উত্তরই এলো না। “গোল্লায় যাও”, নিজের মনে বলে উঠি···তারপর পড়বার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে সিগারেট টানতে থাকি। মাথার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার হাজার-রকমের ফিকির ঘুরতে থাকে। যা হয়ে গেল, বা যা বলে ফেলেছি, কি করে এখন তাকে ভালভাবে আবার শোধরানো যায়, তার জন্যে নানান-রকমের কায়দা-মাফিক ফন্দী ভেবে বার করতে লাগলাম। সিগারেটের পর সিগারেট খাই, আর তাই ভাবি। এক-একবার মনে হয়, তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি, আমেরিকায় দেশান্তরী হই। মনে মনে তার প্লানও ঠিক করে

ফেলি কি করে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যায়; কল্পনায় ধরে নিই যে, কোনরকমে একবার তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; তখন আবার নতুন কোন সুন্দরী এবং সচ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দিয়ে সুখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। এখন কথা হলো কি উপায়ে তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? স্বাভাবিকভাবে যদি তিনি এখন মরে যান, তাহলে তো কথাই নেই, নতুবা ডাইভোর্সের জন্যে আবেদন করতে হবে। মনে-মনে চিন্তা করে দেখি, কি করে ডাই-ভোর্সটা ঘটিয়ে তোলা যায়। কিছুক্ষণ পরেই চেতনা হয়, অবান্তর আমি চিন্তা করে চলেছি, যা ভাবা উচিত, আমি তা ভাবছি না। কিন্তু এ চেতনা ভাল লাগে না, ধোঁয়া দিয়ে তাকে ঘোলাটে করে তুলতে চেষ্টা করি।

ইত্যবসরে সংসারের কাজকর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট পথেই এগিয়ে চলেছিল। ছেলেদের গভর্ণেস্ এসে জিজ্ঞাসা করে, ম্যাদাম্ কোথায়? তিনি কখন ফির্‌বেন? বেয়ারা এসে জিজ্ঞাসা করে, চা দেবো কি এখন? উঠে খাবার ঘরে গিয়ে বসি। ছেলেমেয়েরা সেইখানেই ছিল। তারা আমার দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তাদের চোখে জিজ্ঞাসার সঙ্গে নীরব ভর্ৎসনাও ফুটে ওঠে, বিশেষ করে লীজার, কারণ ইদানীং বাড়ীতে যা-কিছু ঘটছে, তা বোঝবার মতন বুদ্ধি তার হয়ে এসেছে। নীরবে আমরা চা-পান করি···তিনি এখনও ফিরে এলেন না। সারা

সন্ধ্যাটা চলে যায়, তবুও তাঁর দেখা নেই। ক্রমশঃ ছুটো বিপরীত ভাব-ধারা পালা করে আমার মনকে দোলাতে থাকে। একটা হলো রাগ, সেই শেষকালে ফিরে আসবেন, শুধু ছেলেদের আর আমাকে এই সাময়িক অনুপস্থিতি দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া; দ্বিতীয়টা হলো ভয়, হয়ত তিনি আর ফিরবেন না, আত্মহত্যা করবেন। গিয়ে যে তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসবো, কিন্তু কোথায় যাব? তাঁর বোনের ওখানে? সেখানে গিয়ে তাঁর খোঁজ করা আমার দিক্ থেকে কেমন যেন বেয়াড়াই লাগলো। আর তাছাড়া, আমার ব'য়ে গেল, আমাকেই যদি তিনি আঘাত করতে পারেন, তা না হয়, নিজেকে একটু আঘাত করলেনই। আর তাছাড়া যদি এখন আমি এখানে-ওখানে তাঁকে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াই, তাহলে তো তাঁর হাতেই আরো বেশী করে গিয়ে পড়বো···তিনি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তো মনে-মনে সেই আশা নিয়েই গিয়েছিলেন যে, আমি তাঁর পিছু-পিছু তাঁকে খুঁজতে বেরুবো এবং আমি যদি তাই করি, তাহলে পরের বার তিনি তো আরো তেজ করে এই সব কাণ্ড করবেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁর বোনের বাড়ী না গিয়ে থাকেন? ঘড়িতে এগারোটা বেজে গিয়েছে। বারোটা বাজলো। শোবার ঘরে যেতে পারলাম না। বিছানায় একলা শুয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার কোন মানেই হয় না। ভাবি, কোন একটা কাজ নিয়ে যদি ব্যাপৃত থাকা যায়—যেমন ধরুন, চিঠি লেখা বা বই পড়া। কিন্তু তা

করতে গিয়ে দেখলাম, কোন-কিছু করাই তখন আমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পড়বার ঘরে একা অপেক্ষা করে বসেই রইলাম…উন্মাদ রাগের জ্বালায় ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল… কান খাড়া করে শুনছি, যেখান থেকে একটুখানি শব্দ উঠছে… সত্যিকারের শব্দের সঙ্গে কাল্পনিক শব্দও মিশে যাচ্ছে। রাত তিনটে হয়ে এলো…চারটে…তবুও তখন ফিরলেন না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো, তখনও দেখি, তিনি ফেরেন নি। বাড়ীতে যেমন যা হয়, ঠিক তাই হয়ে চলেছে। শুধু সকলের চোখে-মুখে একটা বিভ্রান্ত অসন্তোষের চিহ্ন, সকলেই যেন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে আছে, সেই নীরব জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাকে ভৎ'সনা করে বলতে চাইছে, যা-যা ঘটেছে বা ঘটছে, তার জন্যে আমিই দায়ী। ইতিমধ্যে আমার মনের মধ্যে তখন চলেছে তুমুল দ্বন্দ্ব রাগ আর ভয়ের মধ্যে, রাগ যে, তিনি এইভাবে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন,—ভয় যে, হয়ত খারাপ কিছু ঘটে গিয়েছে। এগারোটার সময় তাঁর দূতরূপে দেখি তাঁর ভগ্নী গাড়ী করে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঠিক এর আগেও যেভাবে যা হয়েছে, এবারেও আবার ঠিক সেইভাবেই তার পুনরাবৃত্তি হতে চল্লো। "দিদির মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। কি ব্যাপার? কি হলো আবার?" "কিছুই নয়।" তাঁর অসম্ভব মেজাজই দায়ী…আমি জোর করে তাঁর ভগ্নীকে জানাই যে, আমি কিছু করি নি। ভগ্নী বলেন, হাঁ, সব

স্বীকার করলাম, কিন্তু এভাবে তো আর বেশীদিন চলতে পারে না।" আমি উত্তরে জানাই, "সেটার জবাব তিনি দিতে পারেন, আমার বলবার কিছু নেই। আমার দিক্ থেকে প্রথমে আমি সাধতে পারবো না। যদি ছাড়াছাড়ি করতে হয়, বেশ তো···" কার্য্যকরী কোন কিছু ব্যবস্থা না করেই তাঁর ভগ্নী ফিরে চলে গেলেন। আমি জোর করেই তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছিলাম যে, এক্ষেত্রে আমি প্রথমে সাধতে পারবো না; কিন্তু তিনি চলে যাবার পর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের ম্লান-বিষণ্ণ-মুখ দেখে আমার সে-সঙ্কল্প দূর হয়ে গেল, আমিই প্রথম না হয় গিয়ে সাধবো। সিগারেটের ধোঁয়া বার করতে-করতে অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়াই। যাবার সময় ইচ্ছা করেই খানিকটা সুরা গ্রহণ করলাম, নিজের হাস্যকর অবস্থা নিজের কাছে লুকোবার জন্যে ইচ্ছে করেই মদের আশ্রয় নিতে হলো।

তিনটের সময় তিনি নিজে গাড়ী করে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে তিনি কোন কথাই বল্লেন না। আমি ধরে নিলাম যে, তিনি হয়ত মিটমাট করে নেবার কথাই মনে-মনে ঠিক করে এসেছেন, তাই আমি তাঁকে গিয়ে বল্লাম যে, তাঁর কুৎসিত ভর্ৎসনা দিয়ে তিনিই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। এই থেকে আবার সুরু হয়ে গেল ঝগড়া। আমার দিকে ফিরে চাইতেই দেখলাম, তাঁর কঠিন মুখে মিটমাট করবার কোন চিহ্নই নেই, সমস্ত মুখটা অসম্ভব

যন্ত্রণায় থম্‌থম্ করছে। তিনি জানালেন যে, তিনি মিটমাট করবার সর্ত্ত শোনবার জন্যে ফিরে আসেন নি, তিনি ফিরে এসেছেন, ছেলেমেয়েদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে, এইভাবে একসঙ্গে বাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই কথা শুনে আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, দোষটা মোটেই আমার নয়, তাঁর রূঢ়কথার দরুণ তিনিই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। আমার দিকে চেয়ে বিজয়িনীর মতন তিনি বলে উঠলেন, খুব হয়েছে, বোঝাতে চেষ্টা করো না যে, তুমি তোমার ব্যবহারের জন্যে অনুতপ্ত! তার উত্তরে আমি বল্লাম, এইজাতীয় মিলনান্তক নাটক আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এই কথা শুনে তিনি কি বলে যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। ছুটে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বার-কয়েক দরজায় ধাক্কা মেরে যখন কোন সাড়া পেলাম না, রেগে নিজের ঘরে চলে গেলাম। আধঘণ্টা পরে লীজা কাঁদতে-কাঁদতে আমার কাছে এসে বল্লো, কি হয়েছে, মা মণির সাড়া পাচ্ছি না কেন? তাকে নিয়ে তাঁর ঘরের সামনে গেলাম, জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, হুড়কোটা আল্‌গাভাবে দেওয়া ছিল বলে খুলে গেল। সোজা বিছানার কাছে গিয়ে দেখি তিনি এক অদ্ভুত-ভঙ্গীতে শুয়ে আছেন, গায়ের জামা আধখানা খোলা, পায়ের বুটজুতো পায়েই আছে। বিছানার ধারে ছোট টেবিলের ওপর একটা খালি বোতল, বোতলে

আফিঙ্ ছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে দেখি, তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। অগত্যা সে-যাত্রা আবার উভয়-পক্ষই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করলাম। কিন্তু আমাদের দুজনারই মনের ভিতর সেই পুরাণো ঘৃণা একইভাবে রয়ে গেল, লাভের মধ্যে তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়ে রইলো একটা নিদারুণ অস্বস্তির যন্ত্রণা, যা এই কলহের দরুণ দুজনকেই সমানে ভোগ করতে হয়েছে। দুজনেই মনে মনে জানতাম, এ কলহে অপর-পক্ষই দোষী। কিন্তু যে রকম করে হোক্ এর একটা মীমাংসা করা দরকার এবং সে-মীমাংসা সাময়িক-ভাবে আমরা করে নিতে বাধ্য হই। জীবন আবার সেই পুরোণ দাগ ধরে নির্দ্দিষ্টপথে এগিয়ে চলতে লাগলো।

কিন্তু এইজাতীয় কলহ কখনও বা এর চেয়েও নিদারুণ, নিয়মিত সংঘটিত হতে লাগলো, কখন সপ্তাহে একবার, কখনও মাসে একবার, কখন প্রতিদিন একবার। এবং প্রত্যেকবারই সেই এক পুরাতন কাহিনী, এতটুকু তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন নেই। ক্রমশ ব্যাপার এতদূর সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, আমি বিদেশে যাবার পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পর্য্যন্ত করলাম। সেবার ঝগড়াটা দুদিন পর্য্যন্ত গড়ালো কিন্তু সেবারেও তা কোনরকমে একটা মনগড়া কৈফিয়ৎ আর জবাবদিহিতে মিটমাট হয়ে গেল এবং আমার আর বিদেশে যাওয়া হলো না।”

"এই ধরণের জীবন যখন যাপন করে চলেছি, আমাদের তুজনার সম্বন্ধ যখন এইরকম এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় সেই লোকটী এসে উপস্থিত হলো, টুকাচেভেস্কী তার নাম। মস্কোতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এলো। চাকর এসে খবর দিতে, তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বল্লাম। ইতিপূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার একরকম ঘনিষ্ঠতাই ছিল। কিন্তু এখন দেখলাম পুরাণো সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে রীতিমত সন্তর্পণে মেপে-জুকে ব্যবহার করতে লাগলো এবং যেভাবে সম্বোধন করতে লাগলো কিংবা যে-সুরে কথা বলতে সুরু করলো, নিকট-বন্ধুর সঙ্গে কেউ তা করে না। আমার দিক্ থেকে আমিও তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি তাকে সাধারণ পরিচিত লোকের মতই গ্রহণ করতে পারি। দেখলাম সে ব্যাপারটা সহজেই বুঝে নিল। এবং কিভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবে, সে-সম্বন্ধে তার মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশই রইলো না।

"যে মুহূর্ত্তে তাকে আবার নতুন করে দেখি, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তাকে দেখে আমার বিতৃষ্ণা জাগে। কিন্তু কি এক অনির্দ্দিষ্ট মারাত্মক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে আমি তার কাছ থেকে সে ব্যাপারটা লুকোতেই চেষ্টা করলাম...উল্টে এমন

ব্যবহার করতে লাগলাম, যাতে সে আরো আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। খুবই সহজ ব্যাপার ছিল, যেমন সে এসেছিল, তেমনি সাধারণভাবে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে দু'এক কথা ব'লে গম্ভীরভাবে তাকে বিদায় দিতে পারতাম···আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু না, তার বদলে তার সঙ্গে তার সঙ্গীত-চর্চ্চার বিষয়ে আলোচনা করলাম···সে নাকি বাজানো ছেড়ে দিচ্ছে, কোথা থেকে সেকথা আমি শুনেছিলান, তাও তাকে জানালাম। তার উত্তরে সে আমাকে জানালো যে, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যে···ইদানীং সে এত কসরৎ করছে যে, জীবনে আর কোনদিন সে এমনভাবে কসরৎ করে নি···এবং তার কথা থেকে সে আমার কথা উত্থাপন করলো···আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমিও একদিন বাজনা নিয়ে রীতিমত কসরৎ করতাম। সেইসূত্রে আমাকে বলতে হলো, আমি আর ইদানীং বাজাই না, তবে আমার স্ত্রী একজন বেশ ভাল বাজিয়ে, সঙ্গীতজ্ঞ। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, পরে সব-কিছু জানাজানির পর, তার সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়ায়, প্রথমদিন থেকেই আমার সঙ্গে যেন তার সেই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমাকে রীতিমত আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। সে বা আমি যা-কিছু বলতাম, তার প্রত্যেক কথাটী আলাদা করে ওজন করে দেখতাম এবং প্রত্যেক কথাটার এমন একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য

দেবার চেষ্টা করতাম, যার সঙ্গতি অন্তত তখন কোথাও আমার জানা ছিল না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম···স্বভাবতই তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত নিয়ে কথাবার্ত্তা উঠলো এবং সে আমার স্ত্রীকে জানালো যে, তিনি যদি পিয়ানো বাজান, তাহলে সে তার সঙ্গে বেহালা নিয়ে সঙ্গৎ করতে রাজী আছে। সেদিন সকালবেলা এবং তারপর থেকে প্রত্যেক-দিনই, আমার স্ত্রীকে অদ্ভুত সুমার্জ্জিত মনে হতে লাগলো, তাঁর রূপ যেন আরো মোহনীয় হয়ে উঠলো। একথা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, প্রথম থেকেই লোকটাকে তাঁর ভাল লেগে গিয়েছিল। তাছাড়া, বেহালায় সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গৎ করবে, এই ব্যাপারটার সম্ভাবনায় তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন ; এতখানি উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্যে থিয়েটার থেকে একজন বাজিয়েকে তিনি ভাড়া করে আনালেন। তিনি যে উল্লসিত হয়েছেন, তা তাঁর দৃষ্টি থেকেই বোঝা যেতো ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে তিনি চোখাচোখী হতেন, আমার মনের কথা বুঝতে তাঁর দেরী হতো না এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারা বদলে যেতো। সেইখান থেকে সুরু হলো প্রবঞ্চনার খেলা। আমি বেশ বড় করে হাসলাম, দেখাতে চেষ্টা করলাম, আমি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

লম্পট লোকেরা যে ভাবে সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিকে চায়, দেখলাম ঠিক সেইভাবে লোকটা আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে কিন্তু মুখে এমন একটা ভাব দেখালো যেন, তার আসল আকর্ষণ

হচ্ছে যে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, স্রেফ সেই কথাই কিন্তু আসলে সে ব্যাপার-সম্বন্ধে তার মনে কোন ঔৎসুক্যই ছিল না। আমার স্ত্রীর দিক্ থেকে আমি দেখলাম, তিনি চেষ্টা করছিলেন, নিজেকে নিস্পৃহ দেখাতে, কিন্তু আমার মুখের ক্ষীণ-বক্রহাসি আর-লোকটার সেই লোলুপ-দৃষ্টি দেখে তিনি মনে-মনে বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। আমার মুখের সেই হাসির মানে কি, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। যে মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রী লোকটাকে দেখেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি দেখেছি, তাঁর চোখে এক অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি, একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি তাদের দুজনকে একসঙ্গে এমন-ভাবে বেঁধে ফেলে যে, তাদের দুজনের হাসি আর চাউনি একতালে বাঁধা পড়ে যায়। লজ্জায় আমার স্ত্রীর মুখ রাঙা হলে, লোকটারও মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো, আমার স্ত্রী হাসলে দেখতাম, লোকটাও হাসতো। সঙ্গীতের কথা নিয়ে খানিকটা আলোচনা হলো···তারপর উঠলো প্যারিসের কথা··· টুক্‌রা-টাক্‌রা অতি-অপ্রোয়জনীয় সব বিষয়···। যাবার জন্যে লোকটা টুপীটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো···একবার আমার স্ত্রীর দিকে, আর একবার আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে যেন অপেক্ষা করে দেখতে লাগলো আমরা কি করি বা বলি। আজও স্পস্ট সে-মুহূর্ত্ত আমার মনে পড়ে···সেই কয়েক সেকেণ্ড সময়···সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি ইচ্ছে করলে তাকে আমাদের বাড়ীতে দ্বিতীয়বার আর পদার্পণ না করার

জন্যে বলতে পারতাম এবং সেই মুহূর্ত্তে যদি তা পারতাম তাহলে আর জীবনের এই দুর্দ্দৈব ঘটে উঠতে পারতো না। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমি একবার লোকটার দিকে, আর একবার আমার স্ত্রীর দিকে শুধু নীরবে চেয়ে দেখলাম। দৃষ্টি দিয়ে আমার স্ত্রীকে যেন বোঝাতে চাইলাম, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও একথা মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করো না যে, আমি এই লোকটার দরুণ ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠেছি। লোকটীকেও নীরব-দৃষ্টি দিয়ে যেন আশ্বস্ত করলাম, তুমি জেনে যাও, তোমাকে ভয় করবো, এতো দুর্ব্বল আমি নই। সুতরাং আমি নিজেই লোকটাকে সন্ধ্যাবেলা আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলাম, বল্লাম, আসবার সময় বেহালাটা সঙ্গে করেই আনবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাবার জন্যে। আমার স্ত্রী অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, লজ্জায় তাঁর দুই গণ্ড রক্তিম হয়ে উঠলো, কেমন যেন ভীত আর চঞ্চল হয়ে আয়োজনটার প্রতিবাদ করতে চাইলেন। বল্লেন, ওঁর সঙ্গে বাজাবার মতন বিদ্যে তাঁর তো নেই। তাঁর এই প্রতিবাদে আমার জেদ আরো বেড়ে উঠলো, আমি জোর করেই ভদ্রলোককে আসতে বল্লাম। আমার মনে আছে, ভদ্রলোক যখন পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন ভদ্রলোকের মাথার পেছনদিক্‌টা দেখে আমার কি যেন একটা বিচিত্র অনুভূতি জেগে উঠলো। কিছুতেই নিজের কাছ থেকে একথাটা লুকোতে পারলাম না যে, লোকটার উপস্থিতি আমাকে শুধু যন্ত্রণা দিয়েই গেল। মনে

মনে ভাবলাম, অন্ততঃ এটুকু ক্ষমতা এখনো আমার আছে, ভবিষ্যতে এমন ব্যবহার করতে পারি, যাতে লোকটার আসা-যাওয়া-সম্বন্ধে আর আমাদের উৎপীড়িত হতে হবে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো, সে-রকম ব্যবহার করার মানে হলো, স্বীকার করা যে, লোকটাকে আমি সত্যিই ভয় করি। আসলে কিন্তু আমি তাকে আদৌ ভয় করি না; আর তা ছাড়া, সে-রকম ব্যবহার করা আমার দিক্ থেকে খুব ভব্যও হবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লোকটী পাশের ঘর থেকে জামা নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। যাতে করে আমার স্ত্রী শুনতে পান, এমনিভাবে সেই ঘরে গিয়ে আবার লোকটীকে আমি সন্ধ্যেবেলা আসবার জন্যে অনুরোধ করলাম এবং স্মরণ করিয়ে দিলাম, যেন বেহালাটী আনতে সে ভোলে না। আমাকে কথা দিল যে, সে নিশ্চয়ই আনবে···

সন্ধ্যেবেলা সে এলো এবং তারা দুজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ বাজালো; কিন্তু প্রথম-দিক্‌টা তাদের বাজনা একেবারে খাপ-ছাড়া হয়ে যেতে লাগলো। আমি নিজে রীতিমত সঙ্গীত ভালবাসি, তাই এই আয়োজন আমি সানন্দেই গ্রহণ করেছিলাম। তাদের সুবিধার জন্যে আমি নিজে গানের বইটা রাখবার জন্যে ষ্ট্যাণ্ড ঠিক করে দিই এবং সেখানে দাঁড়িয়ে স্বহস্তে দরকারমত পাতা উল্টে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মিলিত চেষ্টার পর তারা দুজনে গোটা-দুই গানের গৎ আর মোজার্টের একটা সোনাটা বাজালো। লোকটা সত্যিই অপূর্ব্ব

সুন্দর বাজালো; তার বাজনার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম পরিশুদ্ধ রসবোধের পরিচয় পেলাম, যার চিহ্ন কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই নি। বলা বাহুল্য আমার স্ত্রীর চেয়ে ভদ্রলোক ঢের বেশী ভাল বাজালো এবং যাতে তিনি ক্ষুণ্ণ না হন, কায়দা করে দরকার মত তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চল্লেন। রীতিমত সম্মান দেখিয়ে তাঁর বাজনার উল্টে প্রশংসাও করলো। আমার স্ত্রীর দিক্ থেকে, আমার মনে হলো, তিনি যেন বোঝাতে চাইছিলেন যে, বাজনা বাজানো ছাড়া তাঁর আর বিশেষ কোন আগ্রহ কিছু নেই এবং তিনি যতদূর সম্ভব সহজ সরলভাবেই ব্যবহার করবার চেষ্টা করছিলেন। আমারদিক্ থেকে, যদিও আমি দেখবার চেষ্টা করছিলাম যে, সঙ্গীত-সম্বন্ধেই আমার সমস্ত আগ্রহ, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সারা সন্ধ্যাটা সেদিন ঈর্ষ্যার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছিলাম।

আমার এই যন্ত্রণা যে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তার কারণ, আমি জানতাম যে, আমার ওপর আমার স্ত্রীর সেই পুরোণ বিরাগ ঠিক তেমনি আছে, সেটা এখন প্রায় একটা স্থায়ী অস্বস্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে; অপর পক্ষে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সুযোগ-সুবিধা আমার চেয়ে ঢের বেশী; বাইরের দিক্ থেকে তার চেহারা ঢের বেশী সুসজ্জিত; আর তা ছাড়া সে নবাগত, নতুন এবং সকলের ওপর কথা হলো, আমার স্ত্রীর অন্তরে রেখাপাত করবার মতো তার ছিল নিঃসংশয় সঙ্গীত-প্রতিভা। এই সব কারণের সঙ্গে আমি ভেবে দেখলাম,

আরো কতকগুলি এমন ব্যাপার সংযুক্ত হয়ে যাবে, যার ফলে এই লোকটী শুধু যে আমার স্ত্রীর অন্তরে রেখাপাত করবে, তা নয়, তাঁকে নিঃসন্দেহাতীতভাবে জয় করে নেবে। একসঙ্গে বাজানোর দরকার, এই অজুহাতে তারা এখন পরস্পর পরস্পরের কাছে থাকবার অনায়াস সুযোগ পেয়ে যাবে এবং মানুষের মনের ওপর সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র প্রভাব আছে, বিশেষ করে বেহালার ; আবেগ-প্রবণ মনের ওপর বেহালার মতন প্রভাব বিস্তার করতে আর দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। এইসব কথা আপনা থেকে মনের ভিতর তোলপাড় হতে লাগলো এবং তার ফলে যন্ত্রণার হাত হতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পেলাম না। কিন্তু তবু, এই সব ব্যাপার জানা সত্ত্বেও, হয়ত বা এই সব ব্যাপার জানার দরুণই, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখলাম কোন্ এক অদৃশ্য-শক্তি যেন আমাকে বাধ্য করালো, বাইরের দিক্ থেকে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবার জন্যে, এমন কি, লোকটাকে উল্টে আপ্যায়িত করবারই চেষ্টা করলাম। এই স্নেহ-দেখানোর পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ আর স্পষ্ট করে নির্দ্দেশ করতে পারি না, হয়ত আমার স্ত্রী আর সেই লোকটাকে সেইভাবে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, কোন কারণে বা আশঙ্কায় আমি বিচলিত হই নি ; অথবা সেইভাবে নিজেই চেয়েছিলাম নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে। সে যাই হোক্, এ কথাটা সত্যি যে, প্রথম থেকেই লোকটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ বা সরল হতে পারে নি।

পাছে মনের মধ্যে লোকটাকে খুন করে সরিয়ে ফেলবার

প্রবৃত্তি জাগে, সেইজন্যেই তার সঙ্গে বাধ্য হয়েই আন্তরিক এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। সেদিন রাত্রিতে তাই তাকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলাম, সঞ্চিত সেরা মদ পাত্রভরে পরিবেশন করলাম, উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বাজনার প্রশংসা করলাম, স্নিগ্ধ-স্নেহমাখা হাসি দিয়ে তাকে আবার আমন্ত্রণ জানালাম, সামনের রবিবার সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর সঙ্গে আবার বাজাতে এবং তারপর এইখানেই আহার করতে। সেইসঙ্গে জানালাম যে সেদিন তার বাজনা শোনাবার জন্যে আমার কয়েকজন সঙ্গীত-প্রিয় বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করে আনাবো ···এই ভাবে সেদিনের পালা শেষ হলো···।"

হঠাৎ পদ্‌নিশেফের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো, আসন থেকে উঠে পড়ে সে নড়ে আর একজায়গায় গিয়ে বসলো এবং তার গলা থেকে সেই অদ্ভুত আওয়াজ আবার শোনা গেল।

নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সে আবার বলতে স্বুরু করলো, আশ্চর্য্য, লোকটার উপস্থিতিতে আমার মধ্যে কি নিদারুণ আলোড়নের সৃষ্টিই না হয়েছিল! এই ঘটনার তিন-চারদিন পরে, এক্‌জিবিশন দেখে বাড়ী ফিরছিলাম···বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ বুকের মধ্যে কি-রকম যেন ভার বোধ হতে লাগলো, যেন একটা বিশ-মণি পাথর কে চাপিয়ে দিল হঠাৎ। কেন যে হঠাৎ সে-রকম হলো, প্রথমে ভেবেই ঠিক করতে পারলাম না। পরে মনে পড়লো, বাড়ীর ভেতর ঢুকে পাশের ঘরে হঠাৎ

নজর পড়াতে এমন একটা জিনিষ দেখলাম, যাতে করে সেই লোকটার কথাই আমার মনে জেগে ওঠে। নিজের পড়বার ঘরে এসে যখন বসলাম, তখন বুঝতে পারলাম সে-জিনিসটা কি এবং যা দেখেছি, সেটা ঠিক দেখেছি কি না, তা যাচাই করবার জন্যে আবার উঠে গিয়ে দেখে এলাম। হাঁ, আমি ভুল দেখিনি···সেই লোকটার ওভার-কোর্ট···আনলায় টাঙানো··· রীতিমত একটা দামী সৌখীন ওভার-কোর্ট। লোকটার সম্পর্কে আমি এতদূর বাতিক-গ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, তার সম্পর্কে কোন কিছু একটা নজরে পড়লেই, ভালকরে জানবার আগেই আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতো। বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। হাঁ, ঠিকই, লোকটা এসেছে। সেখান থেকে উঠে আমার শোবার ঘরের দিকে চল্লাম, সোজা বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে নয়, ছেলেদের পড়বার ঘরের ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে। আমার ছোট মেয়ে লীজা যেন একটা কি বই নিয়ে পড়ছিল, আর নার্সটা আমার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শিশুটীকে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে কি-একটা জিনিষের আচ্ছাদন-বস্ত্র বুনছিল। বৈঠকখানার দিকের দরজা খোলাই ছিল এবং পিয়ানোর আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সেই সঙ্গে কানে আসছিল অস্পষ্ট তাদের দুজনের কথাবার্ত্তা। কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পিয়ানোর শব্দ থেকে আলাদা করে তাদের একটী কথাও বুঝতে পারলাম না। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, কথাবার্ত্তার সময় যে পিয়ানো

বাজানো হচ্ছে, সেটা ইচ্ছে করেই বাজানো হচ্ছে···কথাবার্ত্তার শব্দকে···হয়ত চুম্বনের শব্দকে···চাপা দেবার জন্যেই। ভগবান্‌ই জানেন সেই মুহূর্ত্তে আমার মধ্যে যেন অরণ্যের সমস্ত হিংস্র পশু একসঙ্গে জেগে উঠলো। মাথার মধ্যে মারাত্মক কি সব কথা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সেই মুহূর্ত্তে যে জ্বালা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আজ এত দূরে ও তার কথা ভাবতে আমি ভয়ে শিউরে উঠছি।

আমার হৃদয় যেন সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমশঃ স্থির হয়ে গেল··· মনে হলো যেন হাতুড়ির মতন কে বুকে সশব্দে আঘাত করছে। প্রত্যেক ঘৃণা আর আক্রোশের অসহ্য আত্মপ্রকাশের মধ্যে সংগোপনে কোথায় লুকিয়ে থাকে নিজের প্রতি এক অসহায় করুণার ভাব। মনে-মনে ভাবতে শিউরে উঠলাম, ছি, ছি, ছেলেপুলেদের সামনে···এই নার্সের সামনেই! নিশ্চয়ই আমার মুখের মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু ফুটে উঠেছিল, তাই লীজা আমার দিকে ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইলো। মনে-মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করা আমার উচিত? ভেতরে যাব? না, চেষ্টা করেও তা পারলাম না। যদি এখন ভেতরে যাই, ভগবান্‌ই জানেন, কি করতে কি করে ফেলবো! অথচ সেখান থেকে নড়ে চলে যেতেও পারছিলাম না। নার্সটা আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে দেখলো, যেন সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

মনে-মনে ঠিক করলাম, ভেতরে না গিয়ে আমি পারি

না···দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। লোকটা পিয়ানোর কাছেই বসে ছিল, লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে পিয়ানোর গৎটা তোলবার চেষ্টা করছিল, পিয়ানোর আর এক কোণে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন, সামনে কতকগুলো গানের কাগজ ছড়ানো। আমার স্ত্রীই প্রথম আমাকে দেখতে পেলেন এবং ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলেন। তিনি কি আমাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন? তাঁর বাইরের স্থৈর্য্য শুধু একটা নিপুণ অভিনয়ের ভঙ্গী? না, সত্যিসত্যিই, তাঁকে যেরকম স্থির দেখাচ্ছে, ভেতরেও তিনি ঠিক তেমনি স্থির অবিচলিত আছেন? মনে-মনে ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, আমাকে দেখে তিনি একটুও নড়লেন না, কোন রকম চঞ্চলতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না; যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে সেইভাবে দাঁড়িয়েই রইলেন···শুধু দেখলাম, যেন লজ্জায় একটু আরক্তিম হয়ে উঠলেন। আমাকে লক্ষ্য করে স্ত্রী বলে উঠলেন, ভালই হয়েছে, তুমি এসে পড়েছ···সামনের রবিবার কি বাজাবো, এখনো আমরা তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। যে-গলায় তিনি আমাকে এই কথা বল্লেন, আমি জানি, আমার সঙ্গে তিনি যদি একলা থাকতেন, তাহলে কখনই সে-সুরে বলতে পারতেন না। সেই কণ্ঠস্বরের নতুনত্বের সঙ্গে এবং তাঁদের দুজনকে বোঝাবার জন্যে তিনি যেভাবে "আমরা" কথাটা ব্যবহার করলেন, তাতেই আমি উত্তপ্ত হয়ে

উঠলাম। নীরবে আমি লোকটীকে অভিবাদন জানালাম, তার প্রত্যুত্তরে সে আমার হাত ধরে করমর্দ্দন করলো এবং বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে আমাকে জানালো যে, রবিবারের জন্যে সে সঙ্গে করে কতকগুলো সঙ্গীত নিয়ে এসেছে ; কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারে নি, কোন্‌টা বাজাবে··· কোন ভারী ক্লাসিকাল জিনিস, যেমন বিটোফেনের কোন সোনাটা, না হাল্কা অন্য কোন জিনিস। লক্ষ্য করলাম, লোকটা ঈষৎ হেসেই আমার সঙ্গে কথা বল্লো···আমার মনে হলো, সে-হাসি যেন আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই। জবাবদিহিটা এমন স্বাভাবিক আর এত সরল হলো যে, তাতে কোন খুঁৎ বার করা সম্ভবই নয় এবং সেইজন্যেই আমি বুঝলাম যে, সেটা আদৌ সত্যি নয়···আমাকে প্রবঞ্চনা করবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই কোন বন্দোবস্তের কথা আলোচনা করছিল।

আমার মত ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকের কাছে···আমাদের সমাজে আমার মত অধিকাংশ পুরুষই ঈর্ষ্যাপরায়ণ···এমন কতকগুলো সামাজিক রীতিনীতি আছে, যা কার্য্যগতিকে একান্ত বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়···এইসব সামাজিক রীতি-নীতির দরুণই পুরুষ আর নারী মারাত্মকভাবে কাছাকাছি আসতে পারে, অথচ তার জন্যে কোন বাধা-নিষেধ কোথাও থাকে না। আজকে আমাদের সমাজের এই রকমই ব্যবস্থা যে, নাচের সময় পুরুষ আর নারীর অঙ্গাঙ্গী সান্নিধ্য, ডাক্তার আর তার নারী-রোগীদের পরস্পর নৈকট্য···শিল্পী, চিত্রকর

আর গায়কদের মধ্যে পুরুষ আর নারীর একত্র সংমিশ্রণ কেউ যদি বাধা দিতে যায়, তাহলে জগৎ-শুদ্ধ লোক তার পেছনে হাত-তালি দেবে।

দুটী মানুষ জগতের পবিত্রতম শিল্পকলা অর্থাৎ সঙ্গীত, অনুশীলন করছে—একসঙ্গে ; এই অনুশীলনের জন্যে পরস্পরের যেটুকু সান্নিধ্য প্রয়োজন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কদর্য্যতা কোথাও থাকতে পারে না···একমাত্র অতি-মূর্খ, অতি-ঈর্ষ্যা-পরায়ণ যে স্বামী, সেই তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখতে পায়। অথচ নিঃসন্দেহাতীতভাবে সকলেই একথা জানে যে, এইসব ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই, বিশেষ করে সঙ্গীত-অনুশীলনের ব্যাপার নিয়েই আমাদের সমাজের অধিকাংশ কদর্য্য অনাচার সংঘটিত হয়।

বুঝতে পারলাম, আমার নিজের অস্বস্তি দিয়ে তাদের দুজনকে আমি বিপন্ন করে তুলেছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি চুপ করেই থাকলাম, একটা কথাও বলতে পারলাম না। ইচ্ছা হলো, দুজনকে প্রাণভরে গালাগাল দিই, লোকটাকে বাড়ী থেকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিই, কিন্তু তা পারলাম না। তার বদলে মনে হলো, আমার উচিত তাদের সামনে এমনি ভাব দেখানো যে, আমি বন্ধুর মতনই তাদের স্নেহের চোখে দেখছি এবং কার্য্যতঃ আমি নিজেকে তাই দেখাবারই চেষ্টা করলাম। আমি এমন ভাব দেখলাম যে, তাদের বক্তব্য-সম্বন্ধে আমার কোন বিরূপতাই নেই। লোকটাকে দেখে আমার মনে যন্ত্রণার

যতখানি তীব্রতা জেগেছিল, ঠিক সেই অনুপাতেই বাহ্যিক ভব্যতা দেখাবার একটা ঝোঁক হঠাৎ পেয়ে বসলো। সঙ্গীত-নির্ব্বাচন-সম্পর্কে তার রস-বোধের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সেই কথাই লোকটাকে মধুরভাবে জানালাম এবং আমার পন্থা অনুসরণ করতে স্ত্রীকেও অনুরোধ করলাম। আতঙ্কিত মুখ নিয়ে হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ার দরুণ যন্ত্রণাদায়ক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলাম, যতক্ষণ না আবার স্বাভাবিক অবস্থায় তা ফিরে এলো, ততক্ষণ লোকটা থেকে গেল ; কিন্তু আমি ঢোকবার পর সে যে মুখ বন্ধ করেছিল, তা আর খোলেনা। লোকটা বিদায় নিয়ে চলে গেল, ভাবটা যেন, কালকের গান যখন ঠিক হয়েই গেল, তখন আর থাকবার দরকার কি। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, কালকের গানের ব্যবস্থার ব্যাপারটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকই ছিল। ভব্যতা দেখাবার জন্যে লোকটাকে পাশের ঘর পর্য্যন্ত আগিয়ে দিয়ে এলাম এবং বিদায়ের সময় তার নরম শাদা হাতের সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে অস্বাভাবিক রকম জোর দিয়েই কর-মর্দ্দন করলাম··· আমার সাংসারিক জীবনের সুখ আর শান্তি যে ধ্বংস করতে এসেছে, তার সঙ্গে এই রকম ভদ্র ব্যবহার না করে থাকতে পারি ?

"সেদিন সারাক্ষণ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আর একটীও কথা বলতে পারি নি। চেষ্টা করেও পারি নি। তাঁর সান্নিধ্য আমার মধ্যে ঘৃণার এমন দুরন্ত আবেগের সৃষ্টি করছিল যে নিজের সম্বন্ধে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। রাত্রিতে খাবার সময় ছেলে-পুলেদের সামনে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কবে আমি গাঁয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। (পরের সপ্তাহে জেলা বোর্ডের সভায় যোগদান করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে গাঁয়ে যেতে হয়) উত্তরে কোন্ তারিখে যাব, জানালাম। যাবার সময় আমার কি লাগতে পারে জানতে চাইলেন। আমি বল্লাম, কিছুই লাগবে না এবং যতক্ষণ খাওয়া না শেষ হলো ততক্ষণ চুপ করেই বসে রইলাম। খাওয়া শেষ হলে নীরবে টেবিল থেকে উঠে আমার পড়বার ঘরে গিয়ে বসলাম। ইদানীং, আমার ঘরে তিনি আসতেন না, বিশেষ করে দিনের বেলায়। আমি শুয়ে শুয়ে নিজের মনে নিষ্ফল রাগে ফুলছিলাম, এমন সময় আমার মগজে এক অদ্ভুত বীভৎস ধারণা জেগে উঠলো, উরিয়ার স্ত্রীর মতন তিনি হয়ত আসবেন তাঁর পাপের কথা আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করবার জন্যে, নইলে এমন অসময়ে আমার ঘরে আজ তিনি আসবেন কেন? ক্রমশঃ তাঁর পায়ের শব্দ আরো যেন কাছে এলো...তাহলে সত্যি সত্যি তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন? তাই যদি হয়, তাহলে আমি যা ভেবেছি,

তাই তো ঠিক। তা হলে তিনি...দুরন্ত ঘৃণায় মন-ভরে উঠলো। শব্দ আরো কাছে এলো। হতেও বা পারে, তিনি বৈঠকখানা ঘরে যাচ্ছেন। না...হঠাৎ শুনলাম আমার ঘরের দরজার কব্জা শব্দ করে উঠলো...সামনেই দেখি, তাঁর সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ, মুখে ভীরু সঙ্কোচের চিহ্ন; যদিও তিনি প্রাণপণে লুকোবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমার ওপর তাঁর মায়াজাল বিস্তার করবার বাসনা নিয়েই এসেছেন, তার অর্থ যে কি তা জানতে আমার বাকি ছিল না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করলাম...দম বন্ধ হয়ে আসবার মতন হলো। এক দৃষ্টিতে নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট বার করে খেতে আরম্ভ করলাম। আমার গায়ের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে সোফায় আমার পাশে এসে বসলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, বারে, এ কেমন ধারা ব্যবহার? একজন লোক এলো, তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি বসে দুটো কথা কইবে, আর তুমি কি না সিগারেট বার করে খেতে আরম্ভ করলে? আমি ইচ্ছে করেই গা-টা একটু সরিয়ে নিলাম, যাতে করে তাঁর দেহের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না থাকে। তিনি বলে উঠলেন, ও, আমি বুঝতে পেরেছি, রবিবার দিন আমি ওর সঙ্গে বাজনা বাজাবো বলে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছ। আমি উত্তর দিলাম, না, মোটেই নয়, সেজন্যে আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নি।"

তিনি জবাব দিলেন, বল্লেই হবে! তুমি কি মনে করছ, আমি তা দেখতে পাচ্ছি না?

—তা যদি দেখতে পেয়ে থাক, তোমার দেখার তারিফই করবো। আমার দিক থেকে আমি যা লক্ষ্য করছি, সেটা হলো, তুমি একটা পূরোদস্তুর ককেটের মত ব্যবহার সুরু করেছ······

—যদি এই রকম রূঢ় ভাষায় আমাকে গালাগালিই দাও, তাহলে আমি চল্লাম····· ·

—যাও, কিন্তু একটা কথা বিশেষ করে মনে রেখো, এই সংসারের মর্য্যাদা যদি তোমার কাছে প্রিয় বলে না মনে হয়, তা হলে আমার কাছে তুমি প্রিয় হয়ে থাকতে পার না, আমার সংসারের মর্য্যাদাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশী প্রিয়!

—কি? কি বলতে চাও তুমি?

—দোহাই ভগবান! তুমি এ ঘর থেকে এখন চলে যাও... শুধু এই কথাই বলতে চাই···যাও···

আমি জানিনা তিনি সত্যিই আমার কথা বুঝতে পারছিলেন, না, না-বুঝতে-পারার ভাণ করছিলেন, তবে এটা বুঝতে পারলাম যে আমার কথায় তিনি রীতিমত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু চলে গেলেন না। ঘরের মাঝ-বরাবর দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, ক্রমশ তুমি যেরকম ব্যবহার করছো, তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে

উঠছে...তোমার চরিত্র যেরকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে স্বর্গ থেকে দেবকন্যা এলেও তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবে না।......

এবং তিনি ভাল রকমই জানতেন আমাকে কিভাবে কোথায় আঘাত করলে রীতিমত আমার লাগবে, তাই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমার নিজের ভগ্নীর প্রতি আমি একবার কি রকম অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম। একবার রাগে আমার মেজাজ এত খারাপ হয়ে যায় যে আমার ভগ্নীকে আমি অতিরূঢ়ভাবে তিরস্কার করেছিলাম। সে ব্যাপারের স্মৃতি আমার মনে পরম বেদনার মতই থেকে গিয়েছিল। সেকথা তিনি জানতেন বলেই, তিনি বেছে বেছে সেই ক্ষতস্থানেই আমাকে আঘাত করলেন।

তিনি উপসংহারে জানালেন, নিজের ভগ্নীর সঙ্গে যে ঐ রকম ব্যবহার করতে পারে, সে যে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

মনে মনে ভাবলাম, আমাকে অপমান করে, আঘাত করে, লাঞ্ছিত করেই যে তিনি তৃপ্ত হবেন, তা নয়, তাঁর আসল উদ্দেশ্য হলো দেখানো, এসবের জন্যে আমিই দায়ী। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁর ওপর এরকম নিদারুণ ঘৃণা জমে উঠতে লাগলো যে, জীবনে এর আগে ততখানি তীব্রভাবে আর কখনো ঘৃণা করিনি। এই জীবনে প্রথম ইচ্ছে হলো, অন্তরের এই ঘৃণাকে বাইরে দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করি। আমি উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চল্লাম

কিন্তু তক্ষুনি মনে হলো আমি শুধু অন্ধ রাগের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ করতে চলেছি ; মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠলো, এইভাবে নিজেকে রাগের হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে কি ? সেই মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে তার উত্তর পেলাম, হাঁ, ঠিকই হচ্ছে, কারণ, এতে তিনি অন্তত ভয় পাবেন। তাই তাকে আর বাধা দিতে চেষ্টা না করে, যাতে তার শিখা আরো জ্বালাময় হয়ে ওঠে, তার জন্যে মনে মনে তাকে আরো তাতিয়ে তুলতে লাগলাম···যতই তা মনের মধ্যে তীব্রতর হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততই একটা বিচিত্র আনন্দে মনে ভরে ওঠে।

চীৎকার করে উঠি, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও···নইলে খুন করে ফেলবো !

কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলাম। ইচ্ছে করেই গলার আওয়াজ সপ্তমে তুলে চীৎকার করে উঠলাম, গলার আওয়াজ দিয়ে যেন মনের রাগের মাত্রা বুঝিয়ে দিতে চাই। নিশ্চয়ই সে-সময় আমাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল, কারণ দেখলাম, তিনি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সেখান থেকে নড়ে চলে যাবার শক্তি আর তার তাঁর ছিল না। শুধু তিনি বল্লেন, ভাসা, কি হয়েছে তোমার ? আরো জোরে চীৎকার করে উত্তর দিলাম, জানিনা······আমার কাছ থেকে সরে যাও ! আমাকে পাগল না করে তুমি ছাড়বে না দেখছি ! যাও··· তা না হলে, যা ঘটবে, আমি তার জন্যে এতটুকু আর দায়ী হবো না !

আমার সমস্ত আক্রোশকে এইভাবে মুক্ত করে দিয়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটা অঘটন কিছু করবার জন্যে একটা দুর্বার বাসনা জেগে উঠলো, যা থেকে উনি বুঝতে পারবেন আমার মনের এই উন্মাদজ্বালা কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে আজ।

এক দুর্দমনীয় বাসনা হলো, তাঁকে প্রহার করবার, খুন করবার……কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানতাম যে, তা হয় না, তা সম্ভব নয়। সেইজন্যে, ভেতরের দুর্দ্দান্ত বাসনাকে মুক্ত করে দেবার জন্য পাশের টেবিল থেকে একটা কাগজ-চাপা তুলে নিয়ে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানকার মাটীতে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, চীৎকার করে উঠলাম, সরে যাও আমার কাছ থেকে! কাগজ-চাপাটা ছোঁড়বার সময় আমি লক্ষ্য রেখেই ছুঁড়ি, যাতে তাঁর গায়ে না লাগে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে বারাণ্ডায় আমার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমি সামনে হাতের কাছে যা কিছু পেলাম, মোম-দানি, দোয়াত, সব ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে চীৎকার করতে লাগলাম, দূর হও, সরে যাও··· নইলে, যা হবে তার জন্যে আমি দায়ী নই! তিনি সেখান থেকে সরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার উন্মাদনাও বন্ধ হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে নার্স এসে আমাকে জানালো যে, তাঁর হিষ্টিরিয়া হয়েছে। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একবার কাঁদছেন আর একবার হাসছেন, কোন কথাই

বলতে পারছেন না, সর্ব্বাঙ্গ তাঁর ভীষণ কাঁপছে। দেখে মনে হলো, অভিনয় নয়, সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ভোরের দিকে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন এবং আবার আমাদের ঝগড়ার মিটমাট হয়ে গেল···মিটমাট হয়ে গেল, সেই প্রেরণার প্রভাবেই যাকে লোকে বলে 'ভালবাসা'। মিটমাট হয়ে যাবার পর সকালবেলা তাঁর কাছে যখন আমি স্বীকার করলাম যে, ট্রকাচেভেস্কীর ওপর ঈর্ষ্যার দরুণই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, তিনি কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে সহজভাবেই অট্টহাস্যকরে উঠলেন, তাঁর কাছে কথাটা অসম্ভব হাস্যকর মনে হলো; তিনি বল্লেন, তার মতন একটা লোকের ওপর যে তাঁর অনুরাগ পড়তে পারে, একথা মনে করাই অস্বাভাবিক। কোন সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে তার গানে আনন্দ পাওয়া ছাড়া, তার কাছ থেকে অন্য আর কিছু আশা করা কি সম্ভব? যদিও সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গিয়েছে, তবু ও, তুমি যদি চাও, তাহলে বলো, আমি তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিচ্ছি, এমন কি রবিবার দিনও? আমি তাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ব্যস্, সব হাঙ্গামাই মিটে যাবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে এ ব্যাপারে, আসল মজার কথা হলো যে, লোকটা নিজেকে এতখানি বিপজ্জনক সত্যি মনে করে কিনা! আমার দিক থেকে অন্তত আমি একথা বলতে পারি যে, আমার মধ্যে এতখানি দম্ভ আছে যে, আমার সম্পর্কে অন্য লোককে ঐ রকম

চিন্তা করতে দিতেই আমি পারি না।” এবং তিনি যে মিথ্যা বলেছিলেন, তা নয়। তিনি যা বল্লেন, তিনি তা সত্য বলেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। এবং তিনি এইভাবে চেষ্টা করছিলেন, লোকটার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের মনে একটা বিরূপতাকে গড়ে তুলতে, যার সাহায্যে তিনি, লোকটার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। সব কিছুই তাঁর বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো, বিশেষ করে তাঁর পরাজয়ের কারণ হলো, ঐ মারাত্মক সঙ্গীত।

এইভাবে সেদিনকার ব্যাপার মীমাংসিত হয়ে গেল এবং রবিবার যথানির্দ্দিষ্ট নিমন্ত্রিতরা সকলে এলেন এবং তাঁরা তুজনে একসঙ্গে বাজাঙ্গেন।

[২৩]

“একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, আমি ছিলাম অতিরিক্ত দাম্ভিক। নিজেকে জাহির করার এই দম্ভ বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই রবিবার দিন, আমার শক্তি অনুযায়ী আমি চেষ্টা করেছিলাম একটা রাজকীয় ভোজ দেবার। এবং সমস্ত আয়োজন সেই মতই কায়দামাফিক করা হয়েছিল। এমন কি কতকগুলো জিনিস আমি নতুন করে কিনে আনলাম এবং নিজে নিমন্ত্রিতদের বাড়ী গিয়ে আহ্বান জানিয়ে এলাম। সন্ধ্যা

ছ'টা নাগাদ নিমন্ত্রিতরা একে একে এসে উপস্থিত হতে লাগলো এবং লোকটাও, হীরে-বসানো বোতাম-ওয়ালা শার্ট পরে ফিটফাট সান্ধ্য-পোষাকে এসে উপস্থিত হলো। বেশ সহজ-ভাবেই লোকটা সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে বেড়াতে লাগলো ; যে যা প্রশ্ন করে হেসে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দেয় ; তুমি যা কিছু বলতে চাও বা করতে চাও, তা যেন সে আগে থাকতেই জানে এবং সে-ও ঠিক মনে মনে যেন তাই-ই ভাবছিল। তার চরিত্রের মধ্যে যা কিছু ক্রুটী বা দৈন্যতা আমি নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ আনন্দের সঙ্গেই সেদিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্য করছিলাম কারণ, সেই সব ক্রুটী বা দৈন্য আমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে, সে যে-নিম্নস্তরের লোক, সেখানে নেমে আমার স্ত্রী কখনো তার প্রতি অনুরক্ত হতে পারে না। সুতরাং তার প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করার আমার কোন কারণই থাকতে পারে না। ঈর্ষ্যার যন্ত্রণায় মানুষ যতখানি যন্ত্রণা পেতে পারে, আমি তার সবটাই ভোগ করেছিলাম, তাই এখন তার হাত থেকে আমি মুক্ত হতে চাই। আর তা ছাড়া, আমাব স্ত্রী আমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে-আশ্বাশকে ও আমাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এবং আমার স্থির বিশ্বাস হয় যে আমার স্ত্রী আমাকে মিথ্যা স্তোক দেন নি। কিন্তু, তা সত্বেও, যতই কেন আমি মন থেকে ঈর্ষ্যাকে দূরে রাখতে চেষ্টা করি না কেন, আমি কিছুতেই সেদিন আমার স্ত্রী বা সেই লোকটার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছিলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার পর যতক্ষণ না সঙ্গীত আরম্ভ হলো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইভাবেই কেটে গেল। সব সময়েই আমার দৃষ্টি তাদের দুজনের ওপর ছিল, তাদের চলা-ফেরা, তাদের দৃষ্টি যেন তন্ন তন্ন করে বিচার করে দেখছিলাম। আসল খাওয়ার ব্যাপারটা, সাধারণত ডিনার যে রকম আড়ষ্ট ও বিরক্তিকর দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিই হলো, গতানুগতিক, বিরক্তিকর। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই সঙ্গীত আরম্ভ হলো। সেই সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রত্যেকটী ঘটনা, অতি তুচ্ছতম ব্যাপারও, আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই। কেমনভাবে বেহালার বাক্সোটা লোকটা নিয়ে এলো, কেমন করে বাক্সোটা খুল্লো, বাক্সোর উপরে একটা ঢাকনা ছিল, কে একজন তার মহিলা-বন্ধু তাকে তৈরী করে দিয়েছিল, কেমন ভাবে বাক্সো থেকে যন্ত্রটা বার করে তাতে সুর ঠিক করতে লাগলো, আজ ও স্পষ্ট সব মনে পড়ে। মনে পড়ে আমার স্ত্রী উদাসীন নিস্পৃহভাবে পিয়ানোর সামনে এসে বসলেন কিন্তু তাঁর সেই নিস্পৃহ উদাসীনতার আড়ালে আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, তিনি তাঁর ভীরু লজ্জাকেই লুকোতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কারণ তাঁর নিজের বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা স্বাভাবিক ভীরুতা ছিল। মনে পড়ে পিয়ানোর সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা আর পিয়ানো থেকে প্রাথমিক আয়োজনের সুর নির্গত হলো, পিয়ানোর ওপরে ষ্টাণ্ড থেকে গানের বই-এর পাতা সরানোর আওয়াজ এলো,

তারপর, তারা দুজনে পরস্পর পরস্পরকে একবার দেখে নিয়ে মিলিতভাবে নিমন্ত্রিতদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলো...সে-ই প্রথমে তন্ত্রীতে সুর তুল্লো··· সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে এলো···কাণ পেতে যেন সে বেহালা থেকে যে শব্দ উঠছে, 'তাকে অনুসরণ করছে, তারপর ধীরে ধীরে হাত চালাতে সুরু করলো···পিয়ানো তার প্রত্যুত্তরে বেজে উঠলো···কনসার্ট আরম্ভ হলো···"

হঠাৎ পদনিশেফ এখানে থেমে গেল এবং কয়েকবার তার গলা থেকে সেই বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এলো। কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ অনুনাসিক শব্দ করে থেমে গেল, কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। তারপর আবার বলতে সুরু করলো,

"বিটোফেনের ক্রইট্জার সোনাটা তারা বাজাচ্ছিল। তার প্রথম মুখটা আপনার মনে আছে? এ্যাঁ···মনে নেই? উঃ···এক বিচিত্র সঙ্গীত...বিটাফেনের এই সোনাটা··· বিশেষত তার প্রথম অংশটা। এমনিতেই সঙ্গীত হলো এক বিচিত্র জিনিস। আমি বুঝতে পারি না। সঙ্গীত কি? কি তার প্রভাব? তার যে প্রভাব আমরা সচরাচর দেখতে পাই, কি করেই বা তা সম্ভব হয়?

লোকে বলে, সঙ্গীত আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের অন্তরাত্মাকে উন্নত করবার জন্যে। সম্পূর্ণ বাজে কথা। আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, নিশ্চয়ই করে,

এবং তা ভয়ঙ্কর ভাবেই করে কিন্তু অন্তরাত্মার উন্নতির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। অন্তত আমার নিজের সম্বন্ধে আমি অকুণ্ঠভাবেই এই কথা বলতে পারি। সঙ্গীত অন্তরকে উন্নতও করে না, অবনতও করে না, এ শুধু করে তাকে উত্তেজিত। আমি যা বলতে চাইছি, কেমন করে আপনাকে তা বোঝাব? সঙ্গীত আমাকে বাধ্য করে, আমার নিজের সত্ত্বাকে ভুলে যেতে, এমন একটা অবস্থায় আমাকে নিয়ে যায়, যেখানে আমার কোন অধিকার আমার নিজের ওপর থাকে না। আমার অনুভূতির মধ্যে যা নেই, সঙ্গীতের এই সম্মোহনের ফলে আমি মনে করি যে, আমি তাই অনুভব করছি; যা আমার বোধের মধ্যে নেই, আমি মনে করি যে আমি তাই বুঝছি; এবং যা আমার ক্ষমতার বাইরে, আমি মনে করি, যে তাই আমার করা সম্ভব। কথাটা আমি আর একটা ব্যাপার দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি...হাই তোলা বা হাসি যে ভাবে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সঙ্গীতও ঠিক সেইভাবেই কাজ করে। চোখে ঘুম না থাকলেও, সামনে কাউকে হাই তুলতে দেখলে, আমাদের ও হাই তুলতে ইচ্ছা জাগে; হঠাৎ যদি শুনি একদল লোক হাসছে, তাদের হাসির আওয়াজ কাণে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাসি পায়, যদিও হাসির উপলক্ষ কিছু তখন আমার সামনে থাকে না। সেই সঙ্গীতের রচয়িতা সেই সঙ্গীত-রচনার সময়ে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল, তাঁর রচিত সঙ্গীতের মধ্যে

দিয়ে আমাদের সেই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। তখন তার অন্তরের সঙ্গে আমার অন্তর এক হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনের এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিভ্রমণ করে বেড়াই। কিন্তু কেন যে আমার মনের সেই অবস্থান্তর ঘটছে, তা আমি জানি না। যিনি সেই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এক্ষেত্রে যেমন ধরুণ, বিটোফেন ক্রুইটজার সোনাটা রচনা করেছেন, তিনি জানতেন, কেন তিনি মনের সেই অবস্থায় ছিলেন। এবং তাঁর মনের সেই অবস্থার দরুণই তিনি কতকগুলো জিনিস করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেইজন্যেই এই সঙ্গীত রচনার মধ্যে তাঁর সেই মনের অবস্থার একটা সার্থকতা তাঁর কাছে ছিল। কিন্তু আমার কাছে তার কোন সার্থকতাই নেই। তাই যে সঙ্গীত আমরা শুনি, তা শুধু আমদের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি করে শুধু, কোন কিছু সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলে না। কিন্তু সামরিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা হয় না। সামরিক সঙ্গীত শোনার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা নড়তে আরম্ভ করে, সেই সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে তাদের পা ওঠা-নামা করে এবং সেইভাবেই সেই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

যখন নৃত্য-সঙ্গীত বাজানো হয়, লোকে তার ছন্দে তালে নাচতে আরম্ভ করে, তখন সেক্ষেত্রেও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। গির্জ্জার ভেতরে যখন "মাস্" বাজানো হয়, তখন অন্তরের সঙ্গে একটা ধর্ম্মভাবের সংযোগ হয়, এবং সেখানেও

তার একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়া, অন্য সব ক্ষেত্রে, সঙ্গীত শুধু অন্তরে একটা উদ্দেশ্যবিহীন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, সেই চাঞ্চল্যের প্রেরণায় মানুষ কি করবে, সেই চাঞ্চল্য কিভাবে নিজেকে রিক্ত করবে, তার কোন নির্দ্দেশই থাকে না। এই জন্যেই সঙ্গীত মাঝে মধ্যে মারাত্মক হয়ে ওঠে। চীন দেশে সঙ্গীত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তাই থাকাই উচিত। যার যখন খুশী সে যদি সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে লোককে বিমূঢ় করে তাকে দিয়ে যে কোন কাজ করিয়ে নেয়, তাহলে কোন আইন কি তা সহ্য করবে? বিশেষ করে, সেই সম্মোহন-কর্ত্তা যদি, ধরুন উদাহরণ স্বরূপ এমন কোন লোক হয়, যে প্রকৃতই অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ?

তাই যারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে, তাদের হাতে এ-র চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না। এই ক্রুইটজার সোনাটার কথাই ধরুন। একটা বদ্ধ বৈঠকখানা ঘরে, যেখানে মেয়েরা হাঁটু-তোলা স্বল্পবাস পোষাকে ঘোরাফেরা করছে, সেখানে এই সোনাটার প্রথম মুখটা বাজানো কি ঠিক্? সেই বাজনা শোনার পর, উচ্ছ্বসিত হয়ে সবাই মিলে হাততালি দিল, তারপর টেবিলে বসে আইস্-ক্রীম খেতে খেতে আধুনিকতম কুৎসা নিয়ে আলোচনা করতে বসলো—এটা কি ঠিক? জীবনের যেসব অন্তরঙ্গ নিগূঢ় মুহূর্ত্ত খুব কমই দেখা দেয়, এ সঙ্গীত হলো সেই সব মুহূর্ত্তের জন্যই এবং তখনও দেখতে হবে, এই সঙ্গীতের ভাব অনুযায়ী কোন প্রয়োজনীয় কাজ

সেখানে করবার মত আছে কিনা, তবেই এই সঙ্গীত বাজানো চলতে পারে। এই সঙ্গীত বাজানোর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলে ভাবসঙ্গত কোন কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করা, এই সঙ্গীত বাজানোর ফলে আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো অনুরাগ বা প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলা হয় যার পরিপূরক কোন কর্ত্তব্য যদি সেখানে না থাকে…তা হলেই তার ফল বিষময় হতে বাধ্য হয়।

অন্ততঃ এই সঙ্গীত আমার ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মনে হলো আমার মধ্যে যেন জেগে উঠলো নূতনতর সব অনুভূতি, আমার সামনে কে যেন হঠাৎ তুলে ধরলো নবীনতর সম্ভাবনার আশা, যার কথা কোন দিন এর আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার অন্তরের মধ্যে কে যেন গুঞ্জন করে উঠলো, এতদিন ধরে যেভাবে ভেবে এসেছি, যেভাবে জীবন যাপন করে এসেছি, তা ভুল, তার পরিবর্ত্তে এই যে-সুর আজ মনে জেগে উঠলো, এ যেন জাগিয়ে তুল্লো নতুনভাবে জীবনকে ভাববার দেখবার সম্ভাবনার আশাকে! কিন্তু কি যে এই নতুনতর সম্ভাবনা কি তার স্বরূপ, তার কোন স্পষ্ট অভিজ্ঞান অবশ্য তখন জানতাম না কিন্তু একটা নতুনতর জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই হৃদয়কে উদ্বেল করে তুল্লো। যেসব লোককে আমি জানতাম, চিনতাম, আমার স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে সেই লোকটীও, এক সম্পূর্ণ নতুন আলোকে যেন আমার সামনে দেখা দিল। সোনাটার প্রথম মুখটার পর তার পরবর্ত্তী

অংশ ও তারা বাজালো। তার মধ্যে বিশেষ নতুনত্ব কিছু ছিল না, বিশেষ করে তার উপসংহারটা আমার কাছে খুব দুর্বলই] লাগলো। তারপর সমাগত নিমন্ত্রিতদের অনুরোধে তারা দুজনে আর্ণেষ্টের একটা সঙ্গীত আর খানকতক হালকাধরণের জিনিস বাজালো কিন্তু প্রথম শোনা সোনাটার সেই আরম্ভ আমার মনের ওপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার শতাংশের এক অংশ প্রভাবও মনের ওপর পড়লো না। সেদিন সন্ধ্যার বাকি সময়টা আমি বেশ খোস-মেজাজেই ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীকে যতখানি সুন্দর লেগেছিল, এর আগে আর কোন দিন তাঁকে সেরকম সুন্দর দেখিনি। সেই দুই চোখের বিদ্যুৎ-আভা, পিয়ানো বাজাবার সময় তাঁর সেই গম্ভীর সুসংযত ভঙ্গী, সারা দেহের সেই উচ্ছৃঙ্খল পেলবতা, এবং সঙ্গীত শেষ করার পর তাঁর সেই স্নিগ্ধ মধুর মৃদু হাসি, যা তাঁর সমস্ত দেহসৌষ্ঠবকে আলোকিত করেছিল, সেদিন যেন তা সুন্দরতর হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠেছিল। দুচোখ ভরে তা দেখলাম এবং তার কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করবার কোন প্রবৃত্তি তখন জাগে নি। আমি জানতাম, এই সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার মনে যে নতুন অনুভূতির আনন্দ জেগে উঠেছে, তিনিও তাঁর মনে সেই অনাস্বাদিন-পূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি উপভোগ করছেন, তাঁরও মনের জগতে অস্পষ্টভাবে সেই নতুন চেতনা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সেদিনকার সেই

সঙ্গীত-সম্মেলন সম্পূর্ণ সার্থকভাবেই শেষ হয়ে গেল··· নিমন্ত্রিতরা যে-যার ঘরে ফিরে গেল।

আমি যে দুদিনের জন্যে গাঁয়ে চলে যাচ্ছি, সেকথা ট্কাচেভেস্কী জানতো বলে বিদায়ের সময় সে কথা উল্লেখ করে বল্লো, আবার সে যখন মস্কোতে আসবে, তখন যেন আজকের সন্ধ্যার এই আনন্দের পুনরাবৃত্তির সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত না হয়। তার কথা থেকে আমি অনুমান করলাম যে আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতে সে আসতে চায় না এবং এই অনুমানের ফলে চিত্তে খানিকটা শান্তিই পেলাম। এবং এই থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, আমি ফিরে আসার আগেই সে মস্কো ছেড়ে চলে যাবে, সুতরাং তার সঙ্গে আর আমার এখন দেখা-সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই প্রথম অবিমিশ্র আনন্দে তার করমর্দ্দন করলাম এবং আজকের সন্ধ্যার আনন্দ-দানের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সে যখন বিদায় নিলো, সেই বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার স্ত্রী আর আমি, দুজনেই, এই সঙ্গীত-আয়োজনের দরুণ অন্তরে তৃপ্তিই বোধ করলাম।

দুদিন পরে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত অন্তরে গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলাম। গাঁয়ে গেলেই আমি প্রচুর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতাম···সেখানে যেন একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেতাম, একটা স্বতন্ত্র ছোট-খাটো জগৎ, যে-জগতে আমাকে সচরাচর বাস করতে হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে আমার দফতরে, দিনে দশঘণ্টা করে দুদিন উপরি উপরি পরিশ্রম করলাম। গাঁয়ে যেদিন এসে পৌঁছাই, তার পরের দিন, আমার দফতরে বসে আছি, এমন সময় একটা চিঠি আমার হাতে দেওয়া হলো, আমার স্ত্রীর লেখা চিঠি, তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলে পড়লাম, চিঠিতে ছেলেদের কথা, নার্সের কথা, এই কদিন তিনি যে-সব কেনা-কাটা করেছেন তার বিশদ বিবরণ সমস্তই লিখেছেন এবং চিঠির সব শেষে, যেন একান্ত একটা তুচ্ছ সংবাদরূপে জানিয়েছেন, "ট্রুকাচেভেস্কী এসেছিল···যে সঙ্গীতটার কপি আমাকে দেবো বলেছিল, সেটা সঙ্গে করে এনেছিল···আমার সঙ্গে আবার বাজাতে চাইলো কিন্তু আমি রাজী হই নি।" এখন কথা হলো, কোন সঙ্গীতের কপি দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে সে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই স্মরণ করে উঠতে পারলাম না···বরঞ্চ আমার স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সে আমাদের কাছ থেকে পুরোপুরিভাবেই বিদায়

নিয়ে গিয়েছিল। তাই এই সংবাদটী আমার কাছে খুব সুখকর বোধ হলো না। কিন্তু তখন আমার হাতে এত কাজ ছিল যে সেই ব্যাপার ভাবতে বসার কোন সময়ই ছিল না। কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়ীতে ফিরে সেই চিঠিটা আবার ভাল করে পড়লাম। আমার অসাক্ষাতে ট্রুকাচেভেস্কী যে আমার বাড়ীতে এসেছে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির সমস্ত সুর আমার কাছে যেন রহস্যময় বোধ হতে লাগলো। আমার মনের মধ্যে ঈর্ষ্যার সেই উন্মাদ পশু আবার ক্ষিপ্ত হয়ে তার নিজের বিবরে গর্জ্জন করে উঠলো এবং পাছে সে আমাকে পেয়ে বসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মনে মনে বলে উঠলাম, কি জঘন্য এই ঈর্ষ্যার অনুভূতি! আমার স্ত্রী যা লিখেছেন, তার মধ্যে অস্বাভাবিক এমন কি আছে? কিছুই তো নেই। মনকে এইভাবে বুঝিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম এবং কালকে যে-সব কাজ শেষ করতে হবে মনে মনে তার একটা নির্ঘণ্ট করতে লাগলাম। যখন জেলা-বোর্ডের কাজে গাঁয়ে আসতাম, নতুন পরিবেশের দরুণ তাড়াতাড়ি ঘুমুতে পারতাম না⋯কিন্তু সেদিন রাত্রিতে খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে, বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে যেমন লোকে চমকে ওঠে, তেমনি চমকে হঠাৎ জেগে উঠলাম। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি ঘুমের অবচেতন অবস্থার মধ্যে আমার স্ত্রীর কথাই ভাবছি, তাঁর সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা,

ট্রকাচেভেস্কীর কথা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। তাদের দুজনকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে রাগে আর আতঙ্কে আমার মন যেন নিষ্পেষিত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—তবু প্রাণপণ বলে চেষ্টা করলাম, যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে। নিজের মনেই বলে উঠলাম, কি হাস্যকর এই সন্দেহের বাতিক! যে সব সন্দেহ করছি, বাস্তব-জগতে তার ভিত্তি কোথাও নেই! কি করে আমার স্ত্রীকে এত হীন ভাবতে পারলাম? একদিকে একজন অপদার্থ লোক, যাকে বলা যেতে পারে সামান্য একজন ভাড়াটে বাজিয়ে…চরিত্রহীন এ আর একদিকে এক সম্ভ্রান্ত রমণী, একটা বিরাট সংসারের সুযোগ্যা কর্ত্রী… আমার স্ত্রী। অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব! এই হলো চিন্তার একটা ধারা। কিন্তু তার পাশেই দেখি বয়ে চলেছে স্বতন্ত্র আর একটা ধারা…সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তার বক্তব্য। "কেন অসম্ভব কিসে? কেনই বা তা ঘটতে না পারে? সে লোকটা অবিবাহিত, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, চেহারার দিক থেকে ছিপছিপে সুমার্জ্জিত, তার ওপর নীতির কোন বালাই নেই, তার জীবনের আদর্শ হলো, সামনে যা এসে পড়ে, যদি আনন্দ পাও তা লুটে নাও। এবং তাদের দুজনের মধ্যে যোগসূত্ররূপে রয়েছে সঙ্গীত, ইন্দ্রিয়-ভোগের সব চেয়ে পরিমার্জ্জিত উপকরণ। কিসের প্রভাবে লোকটা ভব্যতার নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তেমন কোন কিছুই তার তো মনে নেই। উল্টে, তার উত্তেজনার খোরাক তার চারদিকে। আর

আমার স্ত্রী? কি দিয়ে তৈরী তিনি? যেমন রহস্যময়ী ছিলেন, তেমনী রহস্যময়ীই রয়ে গিয়েছেন। আমি তো তাঁকে সত্যি জানি না। আমি জানি তাঁকে শুধু প্রবৃত্তির বন্দী জীব বলে। প্রবৃত্তির বন্দী যে জীব, সংযম তার কোথায়?

তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাদের দুজনের মুখ, সেই স্মরণীয় রবিবার দিন সঙ্গীত-সম্মেলনে শেষ সঙ্গীতগুলো বাজানোর সময় ঠিক যেরকম দেখেছিলাম। আজ যেন মনে পড়তে লাগলো, সে মুখের মধ্যে দেখেছিলাম উদগ্র কামনারই দীপ্তি। হায়! এ সব দেখে শুনে, মূর্খ আমি, কেন শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে এলাম? যতই তাদের মুখ মনে পড়ে, ততই এক প্রশ্ন মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে থাকে...এটা কি দিবালোকের মতন স্বচ্ছ বোধ হচ্ছে না যে, সেদিন সে-রাত্রিতে তাদের দুজনার মধ্যে বোঝাপড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল? তাদের মধ্যে আর কোন বাধা যে কোথাও ছিল না, স্পষ্ট কি তাদের মুখে সে-কথা সেদিন লেখা ছিল না? তাদের দুজনের মুখে, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর মুখে, যে স্মিত হাস্য লেগেছিল, সে তো স্পষ্ট লজ্জারই চিহ্ন, যা ঘটে গিয়েছে তারই লজ্জিত স্মৃতি? মনে পড়তে লাগলো, পিয়ানোর দিকে যখন আমি এগিয়ে গেলাম, রক্তিম মুখ থেকে ধীরে ঘাম মুছে তিনি স্নিগ্ধ হেসে উঠলেন, ভীরু তৃপ্তির সুকোমল হাসি। তখন থেকেই তারা দুজনে দুজনার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখতে আর পারছিল না...খাবার সময়, যখন লোকটা

আমার স্ত্রীর গেলাসে জল ঢেলে দিচ্ছিল, সেই সময় আবার তারা সংগোপনে পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে চাইলো। সেই মুখ, সেই দৃষ্টি, সেই সলজ্জ দুর্ব্বল হাসি; মনে পড়তেই ভেতর থেকে সর্ব্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠলো। আমার কাণে কে যেন বল্লো, হাঁ গো হাঁ, তাদের মধ্যে এখন সব ঘটনাই ঘটে গিয়েছে। সেই সঙ্গে আর এক কাণে আর একটা আওয়াজ যেন এলো, তুমি অর্দ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছ, তুমি কি জাননা, তা কখনই হতে পারে না? সেই অন্ধকার এক ঘরে, সেই বিভীষিকাময় চিন্তার কবলে পড়ে, এক বিচিত্র ভয়ঙ্কর অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। হঠাৎ দেশলাই নিয়ে একটা কাটি জ্বালালাম···সেই ক্ষণ আলোকে সেই ছোট্ট ঘরের চারদিকের হলদে রঙের দেয়ালের দিকে চেয়ে এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসলো। পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে, যখন লোকে কোন মীমাংসার সূত্রই খুঁজে পায় না, তখন যেমন সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যায়, আমিও তেমনি আমার চেতনাকে অবলুপ্ত করে দেবার জন্যে যাতে করে সেই আপাত-দ্বন্দ্ব আর চোখে না পড়ে, সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। সে রাত্রিতে চোখে আর ঘুম এলো না। ভোর পাঁচটার সময় বিছানা থেকে উঠে পড়লাম, জোর করে ঠিক করলাম যে সেই দুর্বহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কিছুতেই নিজেকে আর রাখবো না, দারোয়ানকে ডেকে আদেশ করলাম, ঘোড়া ঠিক করতে।

দফতরে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে জানালাম যে, এক জরুরী কাজের জন্যে মস্কো থেকে হঠাৎ আমার ডাক এসেছে, তাই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। "আমার অনুপস্থিতিতে আমার জায়গায় অন্য আর কোন সভ্য যেন কাজটা চালিয়ে নেয়। আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল।"

[২৫]

এমন সময় ট্রেণের কামরার ভেতর রেলের কণ্ডাক্টর এসে দেখলো যে কামরার মোমবাতি গর্ত্তে ঢুকে গিয়েছে, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েচলে গেল। পরিবর্ত্তে আর একটা মোমবাতি আর জ্বাললো না। বাইরে তখন দিনের আলো একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে আসছে। যতক্ষণ কণ্ডাক্টর কামরার ভেতর ছিল, পদনিশেফ চুপ করেই রইলো, মাঝে মাঝে শুধু তার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছিলাম। কণ্ডাক্টর চলে যেতে, আধ-অন্ধকারে ছুজনে চুপ করে বসে রইলাম। জানলার শার্সির ঝাঁকানির শব্দ আর ট্রেণের চাকার আর্ত্তনাদের সঙ্গে নিদ্রিত কেরাণীটির একঘেয়ে নিয়মিত নাক-ডাকার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। ভোরের সেই আবছা অন্ধকারে পদনিশেফের চেহারা স্পষ্ট করে চোখে পড়ছিল না। সে আবার বলতে সুরু করলো, বক্তব্যের

সকরুণতার সঙ্গে সঙ্গে তার গলার আওয়াজও তীব্রতর হয়ে উঠলো।

“ঘোড়ার গাড়ীতে ত্রিশ মাইল যাওয়ার পর রেলে উঠতে হবে, রেলে আধ ঘণ্টা লাগবে। সেই ত্রিশ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে আসতে চমৎকার লাগলো। হিমেল শারদ প্রভাত··· চারদিকে আলো ঝলমল করে উঠঁছে রোদ· ·চমৎকার মসৃণ রাস্তা, রাস্তার ওপর সূর্য্যের আলো ঝিকমিক করে উঠছে··· বাতাসে আরাম লাগছে। ভালই লাগলো সে-পথটা ঘোড়ার গাড়ীতে। সকাল হতেই গাড়ী ছেড়ে দিল এবং গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও হাল্কা হয়ে এলো। চারদিকে মাঠঘাট দেখতে দেখতে, পথের মধ্যে যেসব লোকজন পায়ে হেঁটে চলাচল করছিল, তাদের দেখতে দেখতে, আমার গন্তব্য সম্বন্ধে আমি সাময়িকভাবে যেন বিস্মৃত হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি যেন বেড়াতে বেরিয়েছি ; যেসব ঘটনায় আমি বাধ্য হয়ে হঠাৎ এই প্রত্যাবর্ত্তন করছি, যেন বাস্তব জগতে কোথাও তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এবং এই-ভাবে যে নিজেকে ভুলে থাকতে পেরেছিলাম, তার জন্যে মনে এক বিচিত্র তৃপ্তি বোধ করি। যে উদ্দেশে যাচ্ছি, যখনি তার কথা মনে পড়ে যেতো, তখনি মনকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, সে-সম্বন্ধে এখন ভেবে কোন লাভ নেই, যা করবার তা পরে পশ্চাতে ভেবে করা যাবে'খন। যখন ষ্টেশনের আধাআধি এসেছি, তখন হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা ভেঙ্গে গেল। মেরামত

করবার জন্যে থামতে হলো। এই আকস্মিক ঘটনাটী যত তুচ্ছ মনে করেছিলাম, পরে দেখলাম যে, তা মোটেই তা নয়... পথে এই দেরী হয়ে যাওয়ার দরুণ নির্দ্দিষ্ট এক্স্‌প্রেস ট্রেণটা ধরতে পারলাম না। বাধ্য হয়েই কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকার পর এক প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মস্কো আসতে হলো। সেইজন্যে যেখানে ভেবেছিলাম যে ভোরবেলা এসে পৌঁছব; পৌঁছলাম মধ্য রাত্রিতে। বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন রাত একটা বাজে।

সারাপথ প্রাণপণ চেষ্টা করে যে চিন্তাকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, সেই চিন্তাই আমার অজ্ঞাতে সারাপথ আমাকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে এসেছে। ক্রমশ নিজের সন্দিগ্ধ চিন্তার জালে নিজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি যে, সেই চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী জীবিত থাকবেন, সেই লোকটা জীবিত থাকবে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভয়াবহ ঈর্ষ্যার জ্বালা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেল্লো। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তাতে যেন আরো বেশী করে আমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে।

ট্রেণ থেকে নেমে যখন বাড়ী যাবার জন্যে আবার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলাম, তখন হঠাৎ মনে পড়লো, আমার সমস্ত বিছানা-পত্র ভুলে ফেলে এসেছি ট্রেণে। তার জন্যে আবার

ফিরে যাওয়া, সম্ভব হলো না···না, এখন আমাকে বাড়ী যেতে হবে আগে। ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত, এই রাস্তাটুকু কিভাবে এসেছিলাম, আজ আর তা কিছুতেই মনে করতে পারি না। কি তখন ভাবছিলাম? কি বা ছিল আমার ইচ্ছা? কিছুই মনে পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে, এইমাত্র চেতনা মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল যে সামনেই এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যার সঙ্গে আমার ভবিষ্যত জীবনের মর্ম্মান্তিক যোগ আছে। সে ঘটনা যে শুধু আমার চিন্তার মধ্যেই ছিল, না, তার ছায়া আগে থাকতে আমার মনের মধ্যে এসে পড়েছিল, কিছুই বলতে পারি না।

দরজার সামনে এসে গাড়ী থামলো। তখন রাত প্রায় একটা হবে। রাস্তার ধারের দরজার কাছে দেখি দু'একজন গাড়োয়ান দাঁড়িয়ে, যেন ভাড়া নেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সেই কথাই আমার স্বভাবত মনে হলো, কেন না দেখলাম, খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে আলো জ্বলছে, দেখলাম, বৈঠকখানা ঘরে, বারাণ্ডার দিকের জানলায়, সবগুলোতেই দিব্য আলো জ্বলছে। এত রাত্রিতে বাড়ীতে এ-রকমভাবে আলো জ্বলছে কেন, সে সম্বন্ধে মনে কোন আলোড়ন আনবার চেষ্টা না করে, বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম, এবং দরজার বাইরে কলিং-বেল টিপলাম। দ্বাররক্ষী জর্জ্জ এসে দরজা খুলে দিল। লোকটা খুব কাজের এবং আদৌ অসাধু-

প্রকৃতির নয়, তবে একেবারে নির্বোধ। প্রথম জিনিস যা নজরে পড়লো, পাশের ঘরে আলনায় সেই ওভার-কোটটা ঝুলছে···তার সঙ্গে টুপি আর কোটও রয়েছে। স্বভাবতই তাতে আমার বিস্মিত হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না, কারণ, মনে মনে এতক্ষণ ধরে এই ব্যাপারই অনুমান করে আসছিলাম। জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এসেছে? সে উত্তর দিল, টুকাচেভেস্কী! মনে মনে শুধু বল্লাম, ঠিক এই ব্যাপারই তো ভাবছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আর কেউ এসেছে? উত্তর এলো, না, আর কেউ আসে নি। তার কণ্ঠস্বর থেকে আমি বুঝলাম সে যেন আমাকে আশ্বাস দিতে চাইছে, আমাকে খুশী করবার জন্যেই যেন বলছে, সন্দেহ করবার মত আর কেউই আসেনি। নিজের মনেই বলে উঠলাম, ঠিক হয়েছে! জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেরা? জর্জ্জ জানালো, ঘুমুচ্ছে? তাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে, আদেশ করলাম, এক্ষুনি ষ্টেশনে ছুটে যাও···আমার বেডিঙ ফেলে এসেছি! কালবিলম্ব না করে জর্জ্জকে রাস্তায় বের করে আমি সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমি সম্পূর্ণ একা এবং যাহোক কিছু একটা এখুনি আমাকে করতে হবে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ বিচিত্র অনুভূতি পেয়ে বসলো··· সমগ্র দেহ-মন সে অনুভূতির আক্রমণে কেঁপে উঠলো। কিন্তু কি করবো? কিভাবেই বা করবো? তখনও পর্য্যন্ত আমার

মনে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, শুধু এই কথাই তখন স্থির সত্য বলে মনে স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে, তাদের দুজনের মধ্যে যা কিছু ঘটবার তা সম্পূর্ণভাবেই ঘটে গিয়েছে, আমার স্ত্রীর অপরাধ সম্বন্ধে দ্বিধা করবার আর কোন অবকাশই নেই···এবং সে-অপরাধের জন্যে তাঁকে কালবিলম্ব না করে শাস্তি দিতেই হবে···চিরকালের মত তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ইতিপূর্ব্বে আমার মনে দ্বিধা আসতো, কোন কিছু ঘটলেই মনে মনে ভাবতাম, হয়ত ব্যাপারটা সত্যি নয়, হয়ত আমারই ভুল হয়েছে কোথাও··· কিন্তু সেদিন সে-মুহূর্ত্তে সে-জাতীয় কোন দ্বিধাই আর আমার মনে জাগলো না। সমস্ত কিছু যেন অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই লোকটার সঙ্গে এইভাবে একা একা··· আমার সম্পূর্ণ অজান্তে···আর এই রাত্রিরে···এথেকে একটী-মাত্র সিদ্ধান্তই করা যায়, তারা এমন এক অনুভূতির আবেষ্টনীর মধ্যে আছে, যাতে মানুষ জগতে আর সব কিছু ভুলে যায়। অথবা তার চেয়েও ভয়াবহ, এই চরম দুঃসাহসিকতার পথ যে তারা অবলম্বন করেছে, সেটা ইচ্ছে করেই ধীরে সুস্থে হিসেব করেই তারা করেছে। তারা ভেবেছে, এইভাবে প্রকাশ্যে সেই মহাপাপ-অভিসন্ধি যদি তারা চরিতার্থ করে তাহলে সন্দেহ করবার অবকাশই আর থাকবে না। অতি পরিষ্কার, স্বচ্ছভাবেই তা বোঝা যাচ্ছে···কোন সন্দেহ বা ভুল এতে হতে পারে না। একমাত্র একটা চিন্তা অস্বস্তিকর মনে

হতে লাগলো, যদি তারা এই অবকাশে কোন রকমে পালাবার পথ কিছু বার করে ফেলে, আমার চোখে ধূলো দেবার জন্যে যদি কোন নতুন ফন্দী আবিষ্কার করে, যার ফলে আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির এই সাক্ষ্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। হাতে-নাতে তাদের এই পাপ হয়ত আর তখন ধরা না যেতেও পারে।

যাতে কালবিলম্ব না করে তাদের দুজনকে একসঙ্গে ধরতে পারি, সেইজন্যে উঠোন দিয়ে না গিয়ে সোজা বারাণ্ডা ধরে ছেলেদের খেলাঘরের ভেতর দিয়ে পা টিপে টীপে যে-ঘরে তারা বসেছিল, সেইদিকে অগ্রসর হলাম। পাশাপাশি দুটো ছোট ঘর ছেলেদের জন্যে ছিল। প্রথম ঘরটায় এসে দেখি, ছেলেরা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। দ্বিতীয় ঘরে নার্স ঘুমুচ্ছিল, মনে হলো যেন সাড়া পেয়ে সে নড়ে উঠলো, বুঝি জেগে উঠে বসে। জেগে উঠে যদি সে দেখে কি ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে আমার সম্বন্ধে সে যা ভাববে, তা ধারনা করতে আমার বিলম্ব হলো না। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে গভীর এক আত্ম-করুণায় দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো; পাছে ছেলেরা জেগে ওঠে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে তেমনি সন্তর্পণ পায়ে ছুটে আমার পড়বার ঘরে এসে সোফায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম··· নিজেকে রোধ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমি···জীবনে যে-লোক অমর্য্যাদাকর কোন কিছু করে নি···যার মা-বাপ সেই সম্ভ্রান্ত আদর্শ আমরণ বজায় রেখে গিয়েছেন···নিজের সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে যে সারাজীবন

ধরে পারিবারিক শান্তির স্বপ্ন দেখে এসেছে...সেই আমি···স্বামী হিসাবে যে কোনদিন স্ত্রীর অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র কারণ ঘটায় নি···তাকে কিনা আজ এই দৃশ্য দেখবার জন্যে বেঁচে থাকতে হলো? আর···আমার স্ত্রী···পাঁচ-পাঁচটী সন্তানের জননী, সে কিনা একজন সামান্য বাজনাদারের বুকে নিজেকে বিলিয়ে দিল···শুধু সে-লোকটার ঠোঁট দুটো এখনো রঙিন আছে, তাই! না, সে-নারী কখনই মানবী নয়, সে হলো—

আর যে-ঘরে তাঁর ছেলেরা শুয়ে আছে, যে-ছেলেদের জন্যে তিনি সারাজীবন ধরে কি ভালবাসাই না দেখিয়ে এসেছেন···তার পাশের ঘরেই তিনি এই সব করছেন! আর আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে কি চিঠিই না তিনি লিখেছিলেন? কি করে বলবো, কতদিন ধরে এরকম চলছে? হয়ত গোড়া থেকেই এই ভাবে চলছিল গোপনে। আজ রাত্রিতে না এসে যদি কাল সকালে যেমন আসবার কথা ছিল, তেমনি আসতাম, তাহলে এই নারীই তো হাস্যমুখে আমাকে গ্রহণ করতো, আমার জন্যে দেখতাম পরিপাটী করে তিনি চুল বেঁধেছেন, ক্ষীণ কটিদেশকে সুকৌশলে পরিস্ফুট করে পোষাক করেছেন, মদালস মধুর অবসাদে আমাকে আলিঙ্গন করছেন···নার্স টা কি মনে করবে? আর জর্জ্জ? বেচারা লিজা, সেই বা কি ভাববে? লিজার আজ সে-বয়স হয়েছে, যখন সে আশেপাশের ঘটনা একটু-আধটু বুঝতে শিখেছে। নিজের মনে ধিক্কার দিয়ে উঠলাম, হায়রে নির্লজ্জা···হায়রে লম্পট!

শোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু উঠতে পারলাম না। বুকের ভেতর এত জোরে হৃদ-স্পন্দন হচ্ছিল যে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাব ···মরে যাব! আমার স্ত্রী, সেই হবে আমার মৃত্যুর কারণ! আমার মৃত্যুতে তার তো কিছু যায় আসে না। কিন্তু না, আমার এই হঠাৎ মৃত্যু তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যে হবে, তা হতে দেবো না···সে-সুখ থেকে অন্তত যাকে বঞ্চিত করবো! কিন্তু একি করছি? এখানে এই ঘরে বসে আমি এই সব ভাবছি, আর ঠিক এই মুহূর্ত্তে তারা দুজনে সামনের ঘরেই পরমানন্দে খাচ্ছে, হাসছে, আর ···কেন, কেন সেই সময়ই তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেল্লাম না? কোন্ সময়ে? মাত্র এক সপ্তাহ আগে, এই ঘর থেকে যেদিন তাকে বার করে দিয়েছিলাম, নিষ্ফল রাগে যখন এই ঘরের জিনিসপত্রই ভেঙ্গে চুরমার করেছিলাম? স্পষ্ট মনে পড়ছে, সে-সময় আমার মনের অবস্থা কি রকম ছিল। শুধু যে মনে পড়ছে নয়, ঠিক সেদিনকার মতনই তাকে প্রহার করবার, মেরে ফেলবার তীব্র উন্মাদনা আবার জেগে উঠছে।

সেদিনকার মতন আজও, মনের মধ্যে থেকে এক নিমিষের মধ্যে অন্য সব ভাবনা-চিন্তা যেন উবে গেল—একমাত্র চেতনা জেগে রইলো, একটা কিছু করতেই হবে···

"প্রথম যে কাজ করলাম, সেটা হলো, পা থেকে বুট-জুতোটা খুলে ফেলা। সামনের দেয়ালের গায়ে আমার বন্দুক আর ছোরা গুলো টাঙ্গানো ছিল···মোজা-পরা পায়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা দামাস্কাস ছোরা নামিয়ে আনলাম···ভীষণ ধারালো···আনকোরা নতুন, এর আগে আর ব্যবহার করা হয় নি। খাপ থেকে খুলে বার করলাম! খাপটা হাত ফসকে সোফার পেছন দিকে পড়ে গেল···মনে আছে, তখন আর সেটা খুঁজতে চেষ্টা না করে, মনে মনে বলেছিলাম, থাক্, পরে খুঁজে দেখা যাবে, না হয়, মনে করবো হারিয়ে গিয়েছে। ওভারকোটটা গায়ের ওপর ছিল, সেটাকে খুলে রেখে দিলাম। ধীরে···অতি সন্তর্পণে চল্লাম, সেইখানে। কোন রকম শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে এসে, হঠাৎ সজোরে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেল্লাম···

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তাদের দুজনের মুখের চেহারা। এত স্পষ্টভাবে মনে থাকবার কারণ হলো, তাদের সেই মুখের চেহারা দেখে, সেদিন আমার মনে চরম উল্লাস জেগে উঠে ছিল। আমি যা আশা করেছিলাম, তাদের মুখে তাই-ই দেখতে পেলাম, আতঙ্কের ছাপ, ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। যে মুহূর্ত্তে তাদের চোখ আমার ওপর এসে পড়লো, সেই মুহূর্ত্তেই তাদের মুখে একসঙ্গে ভয় আর নৈরাশ্যের যে রেখা-ফুটে উঠলো,—জীবনের শেষদিন

পর্য্যন্ত তার স্মৃতি আমি বহন করে চলবো। লোকটা টেবিলের সামনে বসেছিল, আমাকে দেখবার মাত্র, দেয়ালের দিকে পিঠ করে, উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখের রেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কি নিদারুণ আতঙ্কই না তাকে পেয়ে বসেছে। আমার স্ত্রীর মুখেও সেই এক অনুভূতিই ফুটে উঠেছিল কিন্তু মনে হলো, সে-মুখের মধ্যে যেন আরো কিছু একটা লুকিয়ে আছে। সেই আরো-একটা-কিছু যদি দেখতে না পেতাম, যদি জানতাম সে-মুখের মধ্যে আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু নেই...তাহলে হয়ত সেদিন পরে যা ঘটেছিল, তা না ঘটতেও পারতো। শুধু এক লহমার জন্যে, মাত্র এক লহমা··· তাঁর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, যা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যে-সঙ্গ-সুখ তিনি নির্ব্বিবাদে ভোগ করছিলেন, আমার এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে তাতে বাধা পড়ে গেল এবং সেই অব্যাহত সুখথেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণই তাঁর মুখে আপনা থেকে হতাশার রেখা ফুটে উঠেছে। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, তাঁর অন্তরে তখন একটী মাত্র চিন্তা ছিল, একটী মাত্র বাসনা, সে-বাসনা হলো সেই নিরিবিলি আনন্দ-রস-ভোগে যেন কেউ বাধা না দেয়। লোকটার মুখের ভাব একটু পরেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, তার চোখে এক নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে উঠলো, আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বিনা ভাষায় সে যেন জিজ্ঞাসা করে উঠলো, মিথ্যে কথা বলে এখন কি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে এখুনি

আরম্ভ করা ভাল। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে, একটা-যেন-কিছু ঘটে যাবে...কি সেটা? আমি দেখলাম, আমার স্ত্রীর মুখে প্রথমে যে বিরক্তি আর হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল, লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল...লোকটার জন্যে এক দারুণ দুর্ভাবনা যেন তাঁর মুখে ফুটে উঠলো। ছোরাটা পেছন দিকে লুকিয়ে দরজার সামনে যে কয়েক মুহূর্ত্ত আমি দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি লোকটা ক্রমশ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু হেসে উঠলো এবং চেষ্টা করে গলায় এমন একটা তৈরী-করা নির্লিপ্ততার সুর নিয়ে এসে কথা বলতে সুরু করলো, যে তা পরিণামে হাস্যকর বোধ হতে লাগলো।

—এই আমরা সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের—লোকটা বলতে আরম্ভ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, সত্যি, কি আশ্চর্য্য!

যেন লোকটার কাছ থেকে এই ইঙ্গিতের অপেক্ষায়ই তিনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু সেই লোকটা বা আমার স্ত্রী, দুজনের মধ্যে কেউই তাদের বক্তব্য শেষ করতে পারলো না। এক সপ্তাহ আগের যে মত্ত উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসেছিলো, আজ আবার আমাকে তা পেয়ে বসলো। ধ্বংস করবার জন্যে, খুন করবার জন্যে, সেই উন্মাদ জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এক দুর্বার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসলো এবং সর্ব-দেহ-মন আমি তার কাছে সমর্পণ করে দিলাম।

তারা যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, তা আর তারা শেষ করতে পারলো না। অতি সযত্নে ছোরাটা পেছন দিকে লুকিয়ে রেখে স্ত্রীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম...লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল এই জন্যে যে দেখতে পেলে যদি লোকটা বাধা দেয়! আমি ঠিক করেছিলাম, ঠিক তাঁর স্তনের তলায় পাঁজরায় আঘাত করবো। আঘাত করবার চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই জায়গাটাকেই আঘাত করবার জন্যে আমি ঠিক করে রাখি। যখন আমার স্ত্রীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন লোকটা বুঝতে পারে আমি কি করতে চলেছি···তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো, কি সর্ব্বনাশ করছো, ভেবে দেখ! কে আছ? কে আছ, সাহায্য কর!"

কোন কথা না বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি লোকটার দিকে ছুটে গেলাম। আমার চোখের সঙ্গে তার চোখ মিলতেই, দেখলাম, এক নিমেষের মধ্যে লোকটা যেন শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল···তার সেই রক্তিম ঠোঁট একেবারে রক্তশূন্য শাদা হয়ে গিয়েছে...চোখ ছুটো থেকে যেন অস্বাভাবিক জ্যোতি বেরিয়ে আসছে এবং চরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার, লোকটা তাড়াতাড়ি পিয়ানোর তলায় ঢুকে পড়লো এবং সেখান থেকে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

তার পিছু পিছু ছুটলাম কিন্তু মনে হলো আমার বাঁ হাতের ওপর যেন অসম্ভব রকম ভারি কি একটা ঝুলছে।

আমার স্ত্রী ! তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখলাম তাঁকে ছাড়িয়ে আমি যেতে পারলাম না ; সেই অকস্মাৎ বাধা, তাঁর সমস্ত দেহের বোঝার টান, তাঁর স্পর্শ জগতের ঘৃণ্যতম জিনিষের মত যে স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই—সমস্ত কিছু আমাকে আরো উন্মাদ করে তুল্লো। পিছন ফিরে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে সজোরে কনুই দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করলাম। তিনি চীৎকার করে উঠলেন···বাধ্য হয়েই আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

তাকে ধরবার জন্যে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো, সেই অবস্থায় মোজা-পরা খালি পায়ে নিজের স্ত্রীর প্রেমিকের পেছনে পশ্চাৎ ধাবন করা একটা হাস্যকর ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াবে। সেই উন্মাদ অন্ধ আক্রোশ সত্ত্বেও তখন পর্য্যন্ত অপর লোকে আমার ব্যবহার দেখে কি ভাববে, সে-মানসিক অভ্যাস দূর হয় নি। জীবনের এমন বহু দিন গিয়েছে, যখন এই অন্ধ মানসিক অভ্যাসই আমাকে পরিচালিত করেছে।

তাই তার পেছনে না ছুটে আমি ফিরে স্ত্রীর কাছে এলাম। সোফার ওপর শুয়ে পড়ে আহত চক্ষুর ওপর দুহাত রেখে আমার দিকে তিনি চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে দেখলাম ভয় আর ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে···যেন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড শত্রু আমি—ফাঁদে ধরা পড়লে ফাঁদের দিকে চেয়ে ঠিক

ইঁদুরের চোখে এই রকমই দৃষ্টি ফুটে ওঠে। অন্তত আমি তাঁর মুখে দেখলাম সেই আতঙ্ক আর ঘৃণা…অপরকে ভালবাসার দরুণ যে আতঙ্ক আর ঘৃণা আমার প্রতি জাগতে পারে। সেদিন সে মুহূর্ত্তে যদি তিনি কোন কথা না বলে অন্তত চুপ করে থাকতেন তাহলে হয়ত সে মুহূর্ত্তে আমি নিজকে সম্বরণ করে নিতে পারতাম, যা ঘটে গেল, তা হয়ত তখন না ঘটতেও পারতো।

কিন্তু হঠাৎ তিনি কথা বলতে সুরু করে দিলেন এবং যে হাতে ছোরাটা ছিল, সেই হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

"ভেবে দেখ কি কর্‌তে চলেছ…তার আর আমার মধ্যে কিছু ঘটে নি…কিছু না…আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি…কিছু ঘটে নি।' হয়ত তখনও আমি ইতস্তত করতাম, যদি তিনি শেষের ঐ তিনটী কথা না উচ্চারণ করতেন। কিছু ঘটে নি থেকে আমি ধরে নিলাম যে তার উল্টোটাই ঘটেছে… যা ঘটবার তা সবই ঘটে গিয়েছে। তাঁর কথার একটা জবাব দেওয়া দরকার। যে মানসিক উত্তেজনার চূড়ায় নিজেকে নিয়ে এসেছিলাম, জবাবটা সেখানকার অবস্থার অনুপাতেই হওয়া উচিত।

বাঁহাত দিয়ে তাঁরহাতের কব্জী সজোরে ধরে আমি চীৎকার করে উঠলাম, এখনো মিথ্যে কথা ? নরকের কীট…

কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে তিনি হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

তখনো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছোরাটা ধরে আছি…সেই অবস্থায় ছুটে আর একহাত দিয়ে তাঁর গলা টিপে ধরে তাঁকে সোফার ওপর ফেলে দিলাম…গলা টিপে মেরে ফেলবার জন্যে উদ্যত হলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহ এত কঠিন হয়? মনে হলো, তাঁর গলা যেন কাঠের মতন শক্ত। দুহাত দিয়ে তিনি গলা থেকে আমার হাতটা টেনে ছাড়ালেন…এই মুহূর্তের জন্যেই যেন আমি অপেক্ষা করে ছিলাম…সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতের উদ্যত অস্ত্র বাঁদিকে ঠিক তাঁর পাঁজরের তলায় সজোরে বসিয়ে দিলাম…

এহেন ক্ষেত্রে লোকে যখন বলে যে সাময়িক উন্মত্ততার প্রেরণায় তারা কি করছে সে-সম্বন্ধে তাদের কোন চেতনাই থাকে না, হয় তারা ধাপ্পাবাজী দেয় নয় মিথ্যেকথা বলে। আমি কি করছি বা করতে চলেছি, সে-সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ চেতনা ছিল, এক মুহূর্তের জন্যে আমি সে-সম্বন্ধে অচেতন হই নি। অন্তরের জ্বালার শিখাকে বাতাস দিয়ে দিয়ে যতই উগ্র করে তুলি, ততই চেতনার আলো ভেতরে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে, এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্তরের গহনতম গুহা পর্য্যন্ত তাতে আলোকিত হয়ে ওঠে সুতরাং আমি যা-কিছু করছি সমস্তই স্পষ্ট দেখতে বাধ্য হয়েছি। আমি যা করতে চলেছিলাম, তা যে তার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি জানতাম, তা নয় কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমি সেই কাজে হাত দিয়েছি, সেই মুহূর্ত্তে আমি সচেতন হয়ে উঠেছি, আমি জেনেছি যে আমি

কি করছি···সেই জন্যে একথা আমি অনুতাপ করে বলতে পারি যে, আমি ইচ্ছে করলে তখন হয়,হাত তুলেও নিতে পারতাম। ধরুন না কেন, আমার স্পষ্ট বোধ ছিল যে আমি তাঁর পাঁজরার তলাতেই আঘাত বসিয়েছি এবং এক্ষুণি ছোরা পাঁজরার ভেতরে ঢুকে যাবে। যে-মুহূর্ত্তে আমি এই কাজ করছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝতে পারি যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার আমি করতে চলেছি, জীবনে যা কখনো করিনি এবং যার দরুণ হয়ত ভীষণ ফলাফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু সেই চেতনাটুকু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত শুধু এক নিমেষের জন্যেই জেগে উঠেছিল, এত কাছাকাছি যে বলা চলে, সেই চেতনা আর তার অনুবর্ত্তী হত্যাকাণ্ড প্রায় এক সঙ্গেই সংঘটিত হয়। কিন্তু সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমার চেতনা সুতীব্র ভাবেই স্পষ্ট ছিল। মনে পড়লেই আজও আমি স্পষ্ট অনুভব করি, ছোরাটা ভেতরকার করসেটে যেন ক্ষণিকের জন্যে মৃদু বাধা পেলো, তারপর আর একটা কিসে যেন একটু বাধা লাগলো, তারপর নরম মাংসের ভেতর দিয়ে ছোরাটা সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। দু'হাত দিয়ে তিনি ছোরাটাকে ধরতে গেলেন কিন্তু আটকাতে পারলেন না···

সেই মারাত্মক মুহূর্ত্তে যে সব অনুভূতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, পরে কারাগারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাই নিয়ে ভাবতাম, তার প্রত্যেকটী সূক্ষ্মতম অনুভূতি পর্য্যন্ত মনে করতে চেষ্টা করতাম। ইতিমধ্যে একটা নৈতিক বিপ্লব আমার মনের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায় এবং তার ফলে আমার

বহুধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে, খুন করবার ঠিক এক সেকেণ্ডেও হবে না, আমি ভয়ঙ্করভাবে সজাগ ছিলাম যে আমি খুন করতে চলেছি, একজন স্ত্রীলোককে খুন করছি, আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অক্ষম একজন স্ত্রীলোক···আমার নিজের স্ত্রী। মনের সেই অবস্থা যে কতদূর ভয়ঙ্কর তা কথায় বলে বোঝান যায় না···আমার মনে আছে, তাঁর দেহের মধ্যে ছোরাটা ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিতে চেষ্টা করি, যেন সেইভাবেই, যা হয়ে গেল তা থেকে নিজেকেপ্রতিনিবৃত্ত রাখা সম্ভব হতে পারে। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি···কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো দেখবার জন্যে···যা ঘটে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব কি না।

হঠাৎ তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, চীৎকার করে ডাকলেন, নার্স, নার্স, আমাকে খুন করেছে ও! গোলমাল শুনে নার্স ইতিমধ্যেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখনও পর্য্যন্ত নিশ্চল স্থির দাঁড়িয়েছিলাম, অসম্ভব হলেও আশা ছিল, হয়ত যা ঘটে গিয়েছে, তা ফিরে আসবে। হঠাৎ দেখি ভেতরের জামা ভিজে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম, যা ঘটে গিয়েছে, তা আর কোন উপায়েই ফিরে আসবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, যা ঘটে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনবারও কোন দরকার নেই। ঠিক এই জিনিসই ঘটবে বলে আমি আশা করেছিলাম

এবং এই জিনিসই ঘটা উচিত হয়েছে। তিনি যতক্ষণ না পড়ে গেলেন, ততক্ষণ আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। নার্সটা ছুটে তাঁকে ধরতে এলো, হায় ভগবান!' এতক্ষণ পর্য্যন্ত ছোরাটা আমার হাতেই ছিল···নার্সের কথায় ছোরাটা ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

নার্স বা স্ত্রীর দিকে না চেয়ে নিজেকেই নিজে বলে উঠলাম, উত্তেজিত হলে চলবে না···যা করছি, তা ভেবে-চিন্তেই করতে হবে।

নার্সটা চীৎকার করে কেঁদে বাড়ীর ঝী-কে ডাকলো। বারাণ্ডা দিয়ে গিয়ে ঝিকে তার মনিবাণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আমার নিজের ঘরের দিকে চল্লাম। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করবো? তার উত্তর তৎক্ষণাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। সেখান থেকে উঠে পড়বার ঘরে গিয়ে দেয়াল থেকে থেকে রিভলভারটা নামালাম···পরীক্ষা করে দেখলাম হাঁ, ভর্ত্তিই আছে···টেবিলের ওপর রিভলভারটা রাখলাম। শোফার পেছন দিক থেকে ছোরার খাপটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। বহুক্ষণ ধরে সেই ভাবে বসে রইলাম···শূন্য মন··· কিছুই ভাবি নি···কিছুই মনে করতে চেষ্টা করিনি। শুধু মনের পেছনে একটা অবস্থা অনুভূতি জানিয়ে দিচ্ছিল, সামনের ঘরে রীতিমত গোলমাল হচ্ছে। শুনতে পেলাম, দরজার সামনে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো, তারপর আর একখানা এলো। তারপর শুনলাম, পায়ের শব্দ···দেখলাম সেই ফেলে-আসা

লাগেজটা নিয়ে জর্জ্জ আসছে···কিই বা দরকার সেই লাগেজের ? সে সামনে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, শুনেছ, কি হয়ে গিয়েছে ? দরোয়ানকে বলো, পুলিসে গিয়ে খবর দিতে !

কোন জবাব না দিয়ে সে চলে গেল। সোফা থেকে উঠে সিগারেটের বাক্স আর দেশলাইটা নিলাম···সিগারেট ধরালাম। একটা সিগারেট শেষ হতে না হতে, কেমন যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম···ঘুমিয়ে গেলাম।

প্রায় দুঘণ্টা ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার স্ত্রী আর আমি পরম শান্তিতে সংসার করছি। কি একটা ব্যাপার নিয়ে বচসা হলো কিন্তু আমরা মিটমাট করে নিলাম···মিটমাট করে নেবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা বা অসুবিধা হলো না। বাইরে বচসা হলেও, অন্তরে যে আমরা পরস্পরের বন্ধু···

দরজায় এসে কে যেন কড়া নাড়ছিল, তাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ভাবলাম, নিশ্চয়ই পুলিশ হবে···তাঁকে আমি তাহলে মেরেই ফেলেছি হয়ত। কিংবা তিনি নিজে এসেই দরজায় করাঘাত করছেন··· আসলে হয়ত তেমন কিছুই ঘটে নি।

দরজায় করাঘাত থামলো না। কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে এই উত্তর খুঁজে বার করতে লাগলাম, সত্যিই কি তা ঘটেছে, না, কিছুই ঘটে নি ? নিশ্চয়ই ঘটেছে। মনে পড়ে গেল, ছোরাটা বসাবার সময়' গায়ের জামার দরুণ যে সামান্য প্রতিরোধ অনুভব করেছিলাম, মনে পড়ে গেল

দেহের ভেতর ছোরাটা কি রকম ভাবে ঢুকে গেল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিমানী স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল···সমস্ত দেহের মাংস পেশী সঙ্কুচিত হয়ে এলো।

হাঁ, যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে আর কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই। এখন আর একটা জিনিস ঘটবার বাকি আছে, নিজের হাতে নিজেকে বধ করা। যখন এই কথা ভাবছি, তখনই মনের আড়ালে এ-কথাও জানি যে, আমি তা পারবো না। তবুও উঠে দাঁড়ালাম, রিভলভারটা হাতে তুলে নিলাম। কেমন যেন অসম্ভব মনে হলো। মনে পড়লো, এর আগে আর কতবার এমনি আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প করেছি···তখন মনে হয়েছে সে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। সহজ মনে হয়েছে কারণ সেই চেষ্টার দ্বারাই ভেবে-ছিলাম স্ত্রীকে আতঙ্কিত করে তুলবো। আজ এখন শুধু যে আত্মহত্যা করতে পারি না, তা নয়, সে-চিন্তা পর্য্যন্ত মনে স্থান পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করি নিজেকেই, কেন আত্মহত্যা করবো? কোন উত্তরই দিতে পারি না। দরজায় তেমনি করাঘাত তখন সমানে চলেছে। হাঁ, উঠতে হবে তা হলে, কে দরজা ঠেলছে আগে সেটা দেখতে ত হবে! ভাববার অনেক সময় পরে পাওয়া যাবে···

রিভলভারটা নামিয়ে টেবিলে একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। দরজার কাছে গিয়ে খিল খুলে দিলাম।

দেখি, আমার স্ত্রীর ভগ্নি···বিধবা···ভালমানুষ কিন্তু নীরেট মাথা।

ভদ্রমহিলা কান্না গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, ভাসা, এ সব কি শুনছি? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। স্বভাবতই তাঁর চোখ একটু বেশী পান্‌সে।

বিরক্তকণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, তুমি কি দরকারে এখানে এসেছো?

আমি জানতাম, তার প্রতি রূঢ় হওয়া আমার উচিত নয়, আর তার কারণই বা কি থাকতে পারে? কিন্তু তখন আমার গলা দিয়ে অন্য আর কোন সুরই বেরুলো না।

তবুও তিনি বল্লেন, ভাসা, আইভান জাকারিভিচের কাছে শুনলাম, দিদির আয়ু শেষ হয়ে আসছে···

আইভান জাকারিভিচ হলো ডাক্তার—আমার স্ত্রীর ডাক্তার এবং উপদেষ্টা।

জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, ডাক্তার কি এখানে এসেছে?

তারপর আপনার মনেই বলে উঠলাম, আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে তা আমি কি করবো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বল্লেন, ভাসা, একবার তার পাশে যাও···উঃ···কি ভয়ঙ্কর!

যাবো? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করি। হঠাৎ ভেতর থেকে যেন উত্তর পাই, হাঁ, যাওয়াই উচিত···এক্ষেত্রে সেইটেই হবে একমাত্র করনীয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে খুন করে, তাহলে

স্বামীরই উচিত মুমুর্ষু স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাই যদি বিধান হয়, তাহলে আমারও যাওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে মনে জেগে উঠলো, আত্মহত্যা করবার সংকল্পের কথা। আত্মহত্যা যদি করতেই হয়, দেখা করতে দোষ কি!

নীরবে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে চল্লাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এইবার নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে···মুমুর্ষুর মুখ-বিকৃতি, তার অন্তিম আকুতি···কিন্তু কোন কিছুই আমার অন্তরকে যেন আর স্পর্শ করতে পারে না! হঠাৎ নিজের নগ্নপদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ভদ্রমহিলাকে থামতে বল্লাম, একটু অপেক্ষা করুন! এ-রকম জুতোহীন খালি পায়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না! চটি-জুতোটা পরে আসি।

[২৭]

পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে যখন প্রতিদিনের পরিচিত সেই আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি, আশ্চর্য্যের ব্যাপার হঠাৎ যেন মনে আশা জেগে উঠলো, যা কিছু ঘটে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করছি, হয়ত কিছুই ঘটে নি। কিন্তু তার পরেই যখন নাকে এসে লাগলো সেই শয়তানী ডাক্তারী ওষুধের তীব্র গন্ধ···আয়াডোফর্ম আর কাবলিক এসিডের ঝাঁঝালো গন্ধ··· তখন বাস্তবতার রূঢ় সত্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

ছেলেদের খেলাঘরের পাশ দিয়ে বারাণ্ডা অতিক্রম করে যাবার সময় লীজাকে চোখে পড়লো। আমার দিকে ভয়-

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। মনে হলো, আমার পাঁচ ছেলে-মেয়েই যেন সেই ঘরে রয়েছে, তারা সবাই আমার দিকে অমনি ভাবে চেয়ে আছে। স্ত্রীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল।

প্রথম জিনিস আমার চোখে পড়লো, স্ত্রীর ধূসরাভ সেদিনকার পরিচ্ছদ চেয়ারের ওপর পড়ে রয়েছে, রক্তে কালো হয়ে গিয়েছে। তাঁকে আমার বিছানাতেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছে···বালিশের ওপর মাথা উঁচু করে হাঁটু তুলে শুয়ে আছেন···সেমিজের বোতাম খোলা। যেখানে ছোরার আঘাত করেছিলাম সেখানে কি একটা চাপিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত ঘর আয়াডাফর্মের তীব্র গন্ধে ভর্ত্তি। তাঁকে দেখে প্রথম আমার দৃষ্টি পড়লো, তাঁর ফোলা মুখের ওপর···মুখটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে···চোখ এবং নাকের খানিকটা অংশ নীলাভ কালচে হয়ে গিয়েছে। আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার যখন চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় আমার কনুই-এর আঘাতে ঐ রকম অবস্থা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্ন আর সে মুখে নেই—দেখলে বীভৎসতায় চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়···দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ভদ্রমহিলা কেঁদে বলে উঠলেন, যাও···ওর পাশে যাও···ওর পাশে যাও···

ভাবলাম, হয়ত তিনি অনুতপ্ত···হয়ত তিনি শেষ-মুহূর্ত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করবেন! যদি তাই করেন, আমি কি

করবো ? ক্ষমা করবো ? মরে যে যাচ্ছে, তাকে ক্ষমা করাই তো উচিত ! স্থির করলাম, অন্তত এ-মুহূর্ত্তে আমাকে বীর হতে হবে !

ধীরে তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। অতি কষ্টে তিনি চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন, একটা চোখ তখন রীতিমত আহত হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি বললেন, তোমার বাসনা তুমি পূরণ করেছ, আমাকে খুন করে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ।

দেহের যন্ত্রণার উর্দ্ধে দেখলাম তখনও তাঁর মুখে ফুটে উঠছে, আমার প্রতি সেই পুরাতন, প্রাণহীন নির্জ্জলা ঘৃণা।

"ছেলেদের তুমি—পাবে না…আমি…তোমার কাছে… কিছুতেই…তাদের দিয়ে যাবো না !…ঐ…দিদি…তার কাছেই…ছেলেরা থাকবে।

আমার কাছে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল, তাঁর পাপ, তাঁর ব্যাভিচার…সে সম্বন্ধে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না।

দরজার দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি কেঁদে বলে উঠলেন, হাঁ, যা করেছ, তার জন্যে তোমাকে বাহাদুরী দিয়ে যাচ্ছি ! দরজার সামনে তাঁহার ভগ্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

দেখ, ঐ দেখ, তুমি কি করেছ।

ছেলেদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভেতর থেকে কি যেন হয়ে

গেল। তারপর তাঁর সেই নীলাভ ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে চেয়ে, সেই জীবনে প্রথম আমি নিজকে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম আমার অধিকারের দাবী, ভুলে গেলাম আমার গর্ব্ব। সেই জীবনে প্রথম যেন তাঁর মধ্যে দেখতে পেলাম প্রতিদিনের সহজ নারীকে এবং সেই দেখার অনুভূতির সঙ্গে যা কিছু নিজের বলে আমি গর্ব্ব করতাম, এমন কি আমার হিংসার জ্বালা পর্য্যন্ত, সমস্ত যেন উল্টে আমাকেই আঘাত করলো। যা করেছি, তার ভয়াবহ চেতনা এমন ভাবে আমাকে উদ্বেল করে তুল্লো যে, মনে হলো সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলি, আমাকে ক্ষমা কর! কিন্তু তা করতে পারলাম না। চোখ বুজে চুপ করে রইলেন, কথা বলতে তিনি আর পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর বেদনা বিকৃত মুখ যেন কেঁপে উঠলো, ভৎসনার একটা ভ্রূকুটী স্পষ্ট হয়ে উঠলো ...দুর্ব্বল হাতে তাঁর কাছ থেকে আমাকে ঠেলে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কেন, কেন এ সব ঘটলো? কেন? কি করে ছিলাম আমি?

বল্লাম, আমাকে ক্ষমা কর!

বালিশ থেকে মাথাটা তোলবার চেষ্টা করে তিনি বল্লে উঠলেন, ক্ষমা! কোন মানে হয় না ক্ষমার। যদি কোন রকমে বাঁচতে পারতাম...আমার দিকে বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন...সে-দৃষ্টিতে একটা আতুর ঔজ্জ্বল্য নিমেষের জন্যে ফুটে উঠলো। "তোমার বাসনা তুমি চরিতার্থ করেছ...আমি

…আমি তোমাকে ঘৃণা করি!" সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেঁদে উঠলেন…যেন তাঁর মনের সামনে এক মহা আতঙ্ক মূর্ত্তি ধরে এসে দাঁড়ালো।

"মেরে ফেল, এখন আমাকে মেরে ফেল…আমি ভয় করি না! তবে ওদেরও সেই সঙ্গে মেরে ফেল…তাকেও মেরে ফেল, তাকেও মেরে ফেল! কিন্তু তাকে পাবে কোথায়? সে চলে গিয়েছে! সে চলে গিয়েছে!" তখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমানে বিকারের প্রলাপ চলতে লাগলো। কাউকে আর তখন চিনতে পারছিলেন না…তার পরের দিন দুপুর বেলা মারা গেলেন।

তার আগে সকাল আটটার সময় পুলিসের লোক এসে আমাকে ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে যায়, সেখান থেকে আমাকে কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। বিচারের অপেক্ষায় সেখানে এগারো মাস কেটে যায়। এই এগারো মাস কারাগারে বসে নিজের সম্বন্ধে, নিজের অতীত জীবন সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাববার সুযোগ পাই—এবং তারই ফলে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে সমর্থ হই। ফাঁড়িতে আসবার তিনদিন পরে তারা একবার আমাকে নিয়ে এলো বাড়ীতে—

পদ্‌নিশেফ্ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভেতর থেকে এমন ভাবে কান্নার জোয়ার ঠেলে উঠলো যে তাকে আটকাবার শক্তি আর তার হলো না। বাধ্য হয়েই সে

নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা বিশেষ চেষ্টা করে সে আবার বলতে সুরু করলো,

"শয্যায় শায়িত তাঁর মৃতদেহ দিকে চেয়ে সমস্ত জিনিস যেন সত্যের আলোকে নতুন করে দেখতে আরম্ভ করলাম।'

আবার সে কেঁদে উঠলো কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলো, তাঁর সেই মৃত্যুহিম মুখের দিকে চেয়ে সেই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমি কি করে ফেলেছি। সেই মুহূর্ত্তে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলাম যে, আমি—আমিই তাঁকে খুন করেছি—কিছুকাল আগেও যে দেহ সজীব ছিল, যে ছিল প্রাণচঞ্চল উত্তপ্ত, আমিই তাকে হিম মাংস স্তূপে পরিণত করেছি—জগতে আর কেউ-ই কোন উপায়েই এই অন্যায়ের কোন প্রতিবিধান করতে পারবে না। এই অনুভূতি যে অন্তরে কোন দিন না অনুভব করেছে, সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না আমার মনের অবস্থা! হায়! হায়!!"

শিশুর মত সে কেঁদে উঠলো। বহুক্ষণ ধরে সেই কামরায় আমরা দুজনে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে রইলাম। আমার সামনের আসনেই বসে সে কাঁদছিল, সারা দেহ তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলো, বিদায়!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে—বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়লো। দেহের ওপর কম্বলটা টেনে দিয়ে দিল।

তখন সকাল প্রায় আটটা হবে, আমার গন্তব্য ষ্টেশনে

ট্রেন এসে থামলে নামবার জন্যে আমি উঠে পড়লাম। তার কাছে বিদায় নেবার জন্যে, যেখানে যে শুয়ে ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, না ঘুমোবার ভাণ করে ছিল, তা বলতে পারি না কিন্তু দেখলাম, সে একটু ও নড়লো না। হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করলাম। কম্বলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিতে দেখলাম সে জেগেই আছে। হাত বাড়িয়ে বিদায় নিবার জন্যে বলে উঠলাম, গুড্—বাই। নীরবে সে হাত বাড়ালো। একটা ক্ষীণ হাসি তার অগোচরে তার মুখে ফুটে উঠলো কিন্তু এত মর্ম্মান্তিক করুণ সে হাসি যে চোখের জল রোধ করে থাকা কঠিন হলো।

যে কথা বলে সে তার জীবনের কাহিনী সমাপ্ত করেছিল, সেই একটি কথা দিয়েই সে আমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলো, বিদায়।